

ଜନସେବକ

ବିଶ୍ୱନାଥ

শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
কলিকাতা গেজেট ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬০

বিশ্বপ্রতিভা-সিরিজ—২৩

জনসেবক বিধানচন্দ্র

‘শুকতারা’ সম্পাদক ও ‘নব কল্লোলে’র সহ-সম্পাদক

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

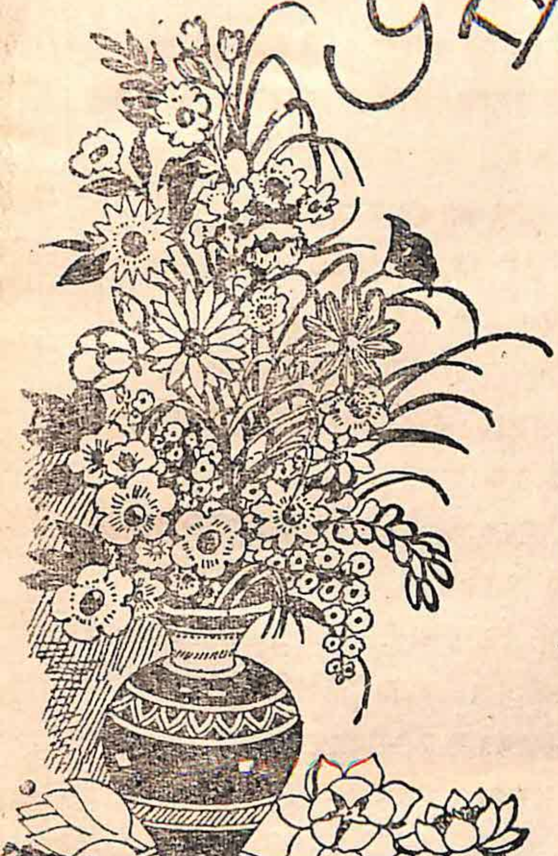
প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জ্যৈষ্ঠ
১৩৭০
৪

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১·৫০

ଉପହାର



কাজই তাঁর আনন্দ

আজকের বাঙলার যারা কিশোর-কিশোরী, তাদের কাছে বিধানচন্দ্রের জীবন ও আদর্শের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের সব চেয়ে বড় ত্রুটী হলো আমরা কাজে আলগা, কাজকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে পড়ে থাকবার দৃঢ়তা আমাদের চরিত্রে নেই। এবং এই দোষের জন্যে আমরা সব জায়গায় মার খাচ্ছি। বিধানচন্দ্রের জীবন হলো বাঙালীর এই জাতীয় দুর্বলতার প্রচণ্ড প্রতিবাদ। তাঁর জন্মদিনে তাই তিনি তাঁর জাতির ভালবাসার উত্তরে জানিয়েছেন, তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম হলো, কর্ম। কাজই তাঁর অবকাশ, কাজই তাঁর আনন্দ, কাজই তাঁর জীবনের অবলম্বন। রাইটার্স বিল্‌ডিঙে যখন সব ঘরের আলো নিভে যায়, তখনো মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে আলো জ্বলতে থাকে। আজ বাঙালীর সবচেয়ে বেশী দরকার এই কাজের ধর্মে দীক্ষা নেওয়া। এবং এই দীক্ষা দেবার যোগ্য পুরুষ হলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী।

জনসেবক বিধানচন্দ্র

—০:*:০—

বংশ-পরিচয়

বাঙলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের খ্যাতি দেশবাসীর কারও অজ্ঞাত নয়।

লোকে অবশ্য ডাঃ রায়কে জানে শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক ও দেশনেতা হিসাবে, কিন্তু বংশগৌরবের দিক থেকেও রায় পরিবারের ঐতিহ্য যে কত মহান্ সে খবর হয়তো অনেকেই জানে না।

ডাঃ রায় হলেন বাংলার গৌরব মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধর। আজ থেকে কয়েক শ' বৎসর পূর্বে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন এক স্বাধীন বাঙালী হিন্দু রাজ্য স্থাপনের। সে স্বপ্নকে তিনি রূপ দিতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

আজও তাই প্রত্যেক বাঙালীর মুখে মুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় প্রতাপাদিত্যের নাম। ডাঃ রায় প্রতাপাদিত্যের বংশের পরবর্তী অষ্টম পুরুষ।

ডাঃ বিধান রায়ের পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র রায়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বহরমপুরে প্রকাশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা প্রাণকালী রায় তখন বহরমপুরের কালেক্টারীতে চাকরি করতেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজবংশের সন্তান হয়েও ডাঃ রায়ের প্রপিতামহ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরে তাঁর রাজ্যের বেশির ভাগ ভূখণ্ডই মুঘল সম্রাট বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন।

যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, বিরাট পরিবারের মধ্যে পুরুষানুক্রমে ভাগাভাগি হতে হতে প্রাণকালীবাবুর ভাগে খুব অল্পই পড়েছিল। সুতরাং রাজবংশের সন্তান হয়েও তাঁকে সংসার প্রতিপালনের জন্য চাকরি নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

প্রকাশচন্দ্র ছিলেন তাঁর পিতার অষ্টম সন্তান। তাঁর বয়স যখন মাত্র ষোল বৎসর, সেই সময়ই প্রাণকালীবাবুর মৃত্যু হয়। অত অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায়

প্রকাশচন্দ্রের শিক্ষার ব্যাপারে বিরাট বাধার সৃষ্টি হল। তাঁর বড় ভাইদের অবস্থাও এমন কিছু সচ্ছল ছিল না। তাঁরা সবাই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিজেদের সংসার নিয়ে। প্রকাশচন্দ্রের দিকে তাকাবার অবসর তাঁদের হল না।

এই অবস্থায় পড়ে প্রকাশচন্দ্রের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন তাঁর ন'দার কাছে বহরমপুরে থাকলেন, কিন্তু তিনি বহরমপুর থেকে যশোরে বদলি হয়ে যাওয়ায় প্রকাশচন্দ্রকে তাঁর আশ্রয় ছাড়তে হল। তিনি তখন কলকাতা চলে এসে হেয়ার স্কুলে ভরতি হলেন। এই স্কুল থেকেই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এণ্ট্রান্স পাস করবার পর তিনি আবার বহরমপুরে ফিরে যান এবং সেখানকার কলেজে এফ্, এ, ক্লাসে ভরতি হন।

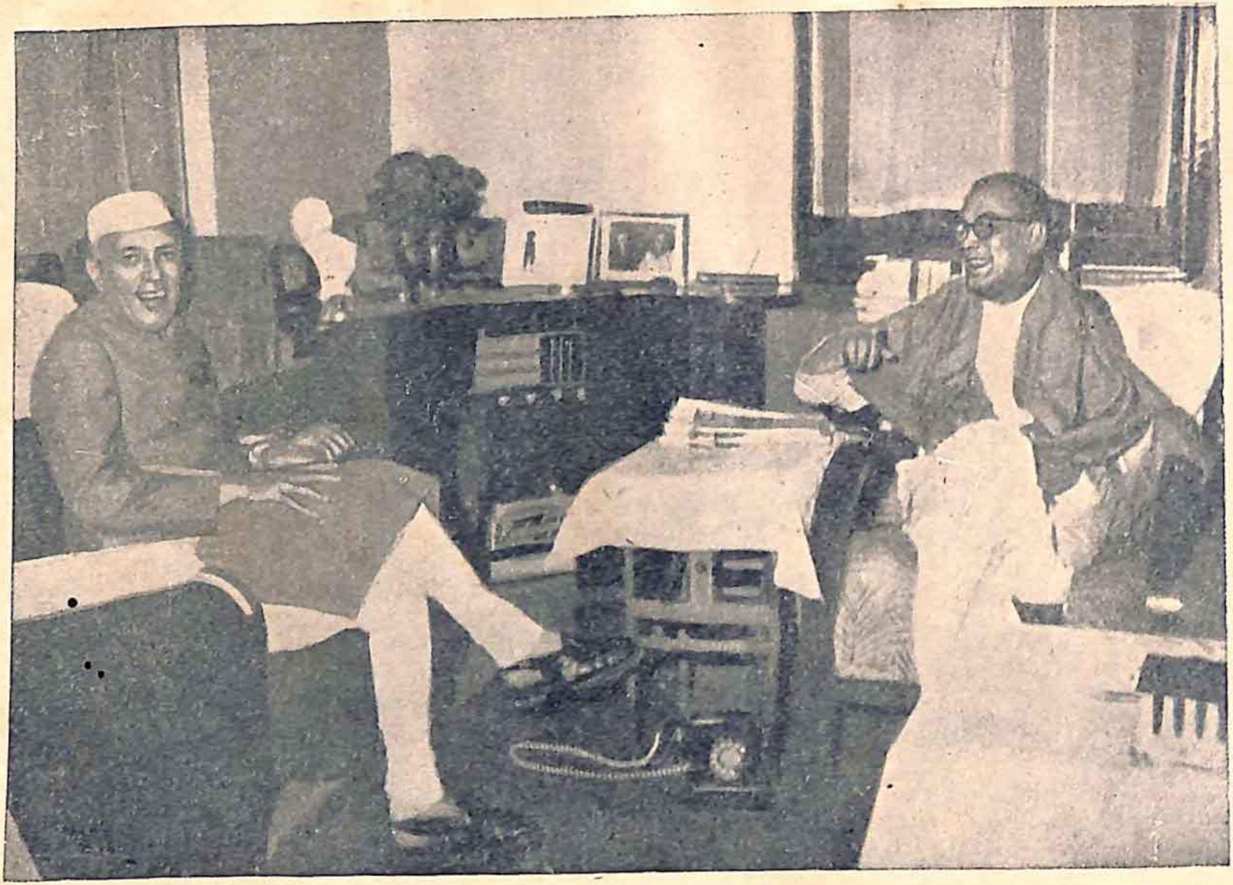
বহরমপুর কলেজে পড়বার সময় তিনি খ্রীষ্টান মিশনারীদের সান্নিধ্যে আসেন। রেভারেণ্ড জে, এস্, হীল্ নামে এক পাদরী সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। হীল্ সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে,

তিনি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করেন। ফলে হীল্ সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। এই মহিলা প্রকাশচন্দ্রকে নিজের ছেলের মতই আদর-যত্ন করতেন।

মিশনারী দম্পতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে প্রকাশচন্দ্রের মন ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সময় ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তাঁর মনের গতি অন্য পথে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্নিহিত উপদেশ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।

এর কিছুদিন পরে তিনি বিপিনচন্দ্র বসুর কন্যা অঘোরকামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠার বৎসর।

অঘোরকামিনী অত্যন্ত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁকে এত বেশী ভালবাসতেন যে, তিনি তাঁকে সব দিক্ দিয়ে উপযুক্ত করে তুলবার চেষ্টা করলেন। বিবাহের আগে অঘোরকামিনী লেখাপড়া জানতেন না। প্রকাশচন্দ্র তাঁকে বাড়িতে লেখাপড়া শেখাতে থাকেন। স্বামীর শিক্ষায় অল্প দিনের মধ্যেই অঘোরকামিনী শিক্ষিতা হয়ে ওঠেন।



ডাঃ রায়ের বাসভবনে পণ্ডিত নেহেরু

শিক্ষায় অঘোরকামিনী কতখানি উন্নতি করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর উত্তর-জীবনে। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং জীবিতকাল পর্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন নেত্রীস্থানীয়া মহিলা বলেও পরিচিতা হন।

প্রকাশচন্দ্রের প্রথম জীবন খুবই দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে কেটেছিল। এমন কি, নিজের পড়ার খরচ চালাবার জন্যে তাঁকে দশ টাকা মাইনের প্রাইভেট টিউশনিও করতে হয়েছিল।

কিন্তু এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও তিনি বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন নি। কঠোর দারিদ্র্যের জন্য বি, এ, পরীক্ষার আগেই তাঁকে চাকরির চেষ্টায় বেরিয়ে পড়তে হয়।

তিনি তখন পোস্ট অফিসের কাজ শিখবেন বলে স্থির করেন।

পোস্ট অফিসের চাকরি করতে হলে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় পাস করতে হয়।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৩৭৷৷০ টাকা বেতনে বর্ধমানের টেম্পোরারী পোস্ট-মাস্টার নিযুক্ত হন।

এ সময়টায় প্রকাশচন্দ্রকে খুবই কষ্টে সংসার চালাতে হত। তিনি আর তাঁর স্ত্রী এমনি হিসাব করে খরচপত্র করতেন যে, ঐ সামান্য বেতন থেকেও তাঁরা তিন মাসে ৫০৲ টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হন।

কিন্তু আবার নেমে আসে দুঃখের দিন। তিন মাস পরে তাঁর সেই টেম্পোরারী চাকরিটি যায়।

চাকরি যাবার পর অনন্যোপায় হয়ে প্রকাশচন্দ্র স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বেরিয়ে পড়েন জীবিকার সন্ধানে। তাঁর হাতে তখন সেই জমানো ৫০৲ টাকাও নেই। স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠাতে তা থেকে কিছু খরচ হয়ে যায়।

সেই সামান্য কয়েকটি টাকা সম্বল করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় এসে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। বন্ধুটির নাম ছিল কেদার। তাঁর একটি ছোট্ট ছাপাখানা ছিল। ছাপাখানাটার নাম ছিল 'রায় প্রেস'। প্রকাশচন্দ্র সেই প্রেসে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসাবে যোগ দিলেন।

কিন্তু প্রেসের অংশীদার হয়ে তাঁর আর্থিক লাভ হল না কিছুই। লাভের মধ্যে এই হল যে, বন্ধুর বাড়িতে তিনি থাকতে আর খেতে পেতেন।

কয়েক মাস কাজ করবার পর ওভাবে পেট-ভাতায় অংশীদারী করতে আর তাঁর ইচ্ছা হল না। তিনি সে কথা তাঁর বন্ধুকে বললেন। তিনি হিসাব নিকাশ করে চল্লিশটি টাকা প্রকাশচন্দ্রের হাতে দেন। কয়েক মাস কাজ করে এই হল তাঁর লভ্যাংশ!

চল্লিশ টাকা পকেটে নিয়ে তিনি আবার বেরিয়ে পড়েন চাকরির চেষ্টায়। কিছুদিন পরেই তিনি বাগুরিয়ার পোস্ট-মাস্টারের চাকরি পান। কিন্তু পোস্ট-মাস্টারী চাকরি তাঁর ভাল না লাগায় তিনি সে কাজে ইস্তফা দিয়ে হরিণবাড়ি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এই স্কুলে তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন।

স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি একটা ভাল চাকরির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন।

এবারে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। তিনি বিহারের মতিহারীতে দুর্ভিক্ষ নিরসন (Famine Relief) কমিটির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের চাকরি পান। এই পদের বেতন ছিল আশী টাকা।

এই চাকরি পেয়েই প্রকাশচন্দ্র আবার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। কিন্তু এবারও তাঁরা খুব কষ্ট করেই সংসার চালাতে থাকেন। বেতনের টাকা থেকে প্রতিমাসে তিরিশ টাকা হিসাবে প্রকাশচন্দ্র তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

মাত্র পঞ্চাশ টাকায় সংসার চালানো যে কত কঠিন, সে কথা বোধ হয় লিখে বুঝাতে হবে না। কিন্তু ঐ সামান্য টাকাতেও অঘোরকামিনী বেশ ভালভাবেই সংসার চালাতেন। এমন কি সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশচন্দ্র জানতেও পারতেন না।

এই চাকরিতে থাকার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা থেকে অঘোরকামিনীর দানশীলতা ও পরদুঃখ-কাতরতার কথা জানতে পারা যায়।

সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় এক ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় বহু লোকের প্রাণহানি হয়। বাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবা-কার্যের জন্য ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এক আবেদন প্রচার করেন। সেই আবেদন পড়ে অঘোরকামিনী তাঁর গায়ের সমস্ত গহনা বিক্রি করে—বিক্রয়লব্ধ টাকা কেশবচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন।

দুর্ভিক্ষ নিরসন কমিটির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের চাকরিতে



অঘোর কামিনী দেবী

বহাল থাকবার সময়ই প্রকাশচন্দ্রের ওপরে কর্তৃপক্ষের সুনজর পড়ে। এই সুনজরের ফলে তিনি আবগারী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরের পদলাভ করেন। এই চাকরিতে থাকা কালেই বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়।

এই সময় থেকেই প্রকাশচন্দ্রের সৌভাগ্যের সূচনা হয় এবং উত্তরকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মানজনক পদ লাভ করেন।

প্রকাশচন্দ্রের মোট পাঁচটি সন্তানের মধ্যে প্রথম দুটি কন্যা সন্তান। তাঁর বড় মেয়ের নাম সুসর্বাসিনী ও মেজ মেয়ের নাম সরোজিনী। সরোজিনী দেবী আজও বেঁচে আছেন।

এই দুটি মেয়ের পর প্রকাশচন্দ্রের তিনটি পুত্র সন্তান জন্মে। ছেলেদের মধ্যে বিধানচন্দ্র সর্বকনিষ্ঠ। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে বিধানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম সুবোধচন্দ্র ও সাধনচন্দ্র। সুবোধচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। ইনি এখনও জীবিত আছেন। বিধানচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা সাধনচন্দ্র জীবিত নেই। তাঁর কন্যা রেণু চক্রবর্তী বর্তমানে লোকসভার সদস্যা এবং কমু্যনিস্ট পার্টির নেত্রীস্থানীয়া।

এখানে বিধানচন্দ্রের মাতা অঘোরকামিনী দেবীর সম্বন্ধে কিছু না লিখলে পাঠক-পাঠিকার কাছে তাঁর উচ্চাদর্শ ও বিদ্যানুরাগের কথা অপরিজ্ঞাত থেকে যাবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিবাহের সময় অঘোরকামিনী মোটেই লেখাপড়া জানতেন না। বিবাহের পর প্রথমে তিনি স্বামীর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে তিনি নিজের চেষ্টায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ এতই প্রবল ছিল যে, পরবর্তী কালে তিনি তাঁর মেয়েদের সঙ্গে ইংরেজী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজী ভাষা শিখবার জন্য তিনি তাঁর মেয়েদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌএর 'ইসোবেলা থবার্ন' কলেজে এক বৎসর শিক্ষালাভ করেন। ঐ কলেজে থাকবার কালে তিনি যে শুধু ইংরেজী ভাষাই শিখেছিলেন তা নয়; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।

লক্ষ্ণৌতে থাকবার সময় কলেজের প্রতিষ্ঠাত্রী মিস্ ইসোবেলা থবার্নএর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়। মিস্ থবার্ন তাঁকে কোন সময়েই ছাত্রী বলে মনে করতেন না। অঘোরকামিনীকে তিনি অন্তরঙ্গ বান্ধবী ও সর্বক্ষণের সহচরী করে নিয়েছিলেন।

ঐ কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করে অঘোরকামিনী নিজেই একটি বোর্ডিং-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলটি স্থাপিত হয় পাটনা শহরের বাঁকীপুর অঞ্চলে।

স্কুল-পরিচালনায় অঘোরকামিনীর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ—এবং তা সাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ঐ স্কুলটি সম্বন্ধে তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর' ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অঘোরকামিনীকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।*

---

*"By far the most notable Institution, however, at Bankipur is an unpretentious Boarding House, managed by a Brahmo lady and her two daughters. Mrs. Prakash Chandra Roy is the wife of a gentleman who holds a respectable Government appointment and who is in well-to-do circumstances. With her husband's full consent, Mrs. Roy went with her two daughters to Lucknow to study at Miss Thoburn's Institution there. One of the daughters is now twenty-four, the other is much younger. The elder is married, but continues to live with her parents and to help them in their benefi-cent work. The younger girl is a pert. She is un-married and looks after the children in the Boarding House with a little mother's care and sets there the

অঘোরকামিনী দেবী কিভাবে স্কুল পরিচালনা করতেন, ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর পত্রিকার ঐ সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। শুধু তিনিই নন, তাঁর কন্যা দুটিও ঐ স্কুল ও বোর্ডিং পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করতেন।

---

example of true sisterly love and self-sacrifice. Mrs. Roy speaks English fluently and is well read.

Early in the morning the children in her home offer their prayers in their own simple way, for no set of prayers are used and no compulsion is put upon their tender conscience. Each of the elder boarders is in charge of one or two of the younger ones and each keeps a small diary in which she notes down every day her failings and backslidings, if any. The boarders attend the female school conducted under Mrs. Roy's supervision and are helped in their studies at home by her and her daughters. The whole cost of education and boarding amounts to Rs. 7 and odd per month. The children look blithe and lively and the lessons of purity, self-help and self-sacrifice taught to them by example and precept are likely to have an enduring influence on their after-life.

The Boarding House is not kept for profit ; indeed, the amount charged to the boarders, is much less than the actual cost. The deficit is made up by Mr. Roy who takes the deepest interest in the work of his wife and daughters."



প্রকাশচন্দ্র রায়

বোর্ডিং-এ যে সব ছাত্রী থাকতো তাদের কাছ থেকে মাসে মাত্র সাত টাকা করে নেওয়া হ'ত।

সাত টাকায় থাকা, খাওয়া এবং শিক্ষার ব্যয় সংকুলান হ'ত না। বাকি টাকা যা ঘাটতি পড়তো, তা প্রকাশচন্দ্র বহন করতেন।

এই রকম পরহিতব্রতী বাপ-মায়ের সন্তান বলেই বিধানচন্দ্রের মধ্যেও পরদুঃখকাতরতা ও দরিদ্রের প্রতি দয়া লক্ষ্য করা যায়।

বিধানচন্দ্রের জন্মের তিন বৎসর পরে তাঁর পিতা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের উচ্চপদে উন্নীত হন। কর্মজীবনের অবসরে প্রকাশচন্দ্র আর তাঁর স্ত্রী ভারতের বহু জায়গা ভ্রমণ করেছেন। একবার দার্জিলিং গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, সুযোগ পেলেই তাঁরা মহর্ষির বাড়ীতে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও সেই সময় তাঁদের পরিচয় হয়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ চিরদিন প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

কঠোর পরিশ্রম করবার ফলে অঘোরকামিনীর শরীর ভেঙে পড়ে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু অসুস্থ

দেহ নিয়েও তিনি স্কুলের কাজ করতে থাকেন। এর ফলে শীঘ্রই তিনি শয্যাগত হয়ে পড়েন। সে অসুখ আর তাঁর ভাল হয় না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে স্বামী ও পাঁচটি সন্তান রেখে তিনি ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে প্রকাশচন্দ্র একেবারে ভেঙে পড়েন। কিন্তু ভেঙে পড়লেও ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়ে তিনি তাদের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। পিতার কর্তব্য ও মাতার স্নেহ নিয়ে তিনি ছেলেদের মানুষ করে তুলতে সচেষ্ট হন।

উচ্চশিক্ষার জন্য তিন ছেলেকেই তিনি বিলাত পাঠিয়েছিলেন। বড় ছেলে সুবোধচন্দ্র ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। মেজ ছেলে সাধনচন্দ্র হন ইঞ্জিনিয়ার। ছোট ছেলের পরিচয় তো সবাই জানেন। ইনি ডাক্তারী শাস্ত্রের উচ্চতম পরীক্ষা এম. ডি., এম. আর. সি. পি. ও এফ. আর. সি. এস্, পাস করে ফিরে আসেন।

———

শৈশব জীবন

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বাড়ীর ছোট ছেলেই বেশী আদর-যত্ন পায়। বিশেষ করে সে যদি রোগা-পাতলা হয় তাহলে তো কথাই নেই। সেই ছেলের আদর-যত্নই হয় সব চেয়ে বেশী।

বিধানচন্দ্রও ছেলেবেলায় রোগা-পাতলা ছিলেন, তাই তাঁর বেলাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না।

ছেলেবেলাতে বিধানচন্দ্র অল্প কারণেই খুব ভয় পেতেন। পারতপক্ষে অন্ধকারের দিকে তিনি যেতে চাইতেন না। অন্ধকার দেখলেই তাঁর মনে হ'ত যে, সেখানে দলে দলে ভূত-প্রেত নেচে বেড়াচ্ছে আর হা-হা হি-হি করে হাসছে।

অন্ধকারের প্রতি এই ভয় তাঁর এসেছিল ভূতের গল্প শুনে। ছেলের এই অন্ধকার-ভীতি দেখে প্রকাশচন্দ্র তাঁকে নানাভাবে বুঝাতে থাকেন যে, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই, আর থাকলেও তারা অন্ধকারে এসে নেচে বেড়ায় না, বা হা-হা হি-হি করে হাসে না।

কিন্তু তাতেও বিধানচন্দ্রের মন থেকে ভয় যায় না দেখে

প্রকাশচন্দ্র এক নূতন উপায় বের করলেন। বিধানচন্দ্রকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, অন্ধকারে যেতে ভয় হ'লে ভগবানের নাম করতে হয়। ভগবানের নাম করলেই ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা সবকিছু পালিয়ে যায়। শুধু উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না; সেই উপদেশ মতো কাজ করে সত্যিই ভূত-প্রেত দূর হয়ে যায় কিনা বিধানচন্দ্রকে তা পরীক্ষা করে দেখতে বললেন।

বিধানচন্দ্রও বাবার কথা শুনে ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সত্যিই ভগবানের নাম স্মরণ করলে অন্ধকারে আর ভয়ের কিছু থাকে না। বার কয়েক পরীক্ষা করবার পরেই তাঁর মন থেকে অন্ধকার আর ভূতের ভয় দূর হয়ে গেল।

বিধানচন্দ্রের মেজদার নাম ছিল সাধন, সে কথা আগেই বলেছি। এই সাধন নামের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর ঠাকুরমা বিধানের নাম দিয়েছিলেন ভজন। সাধন আর বিধানকে তিনি ডাকতেন 'সাধন-ভজন' বলে।

একদিন প্রকাশচন্দ্র কথায় কথায় সাধন-ভজনের কথা উল্লেখ করেন।

বাবার মুখে সাধন আর ভজন এই দুটি কথা শুনেই বিধান হঠাৎ বলে উঠলেন, বাবা, তোমার তো সাধন-ভজন

দু'জনই আছে। একথা শুনে সবাই হেসে উঠেছিলেন সেদিন।

বিধানচন্দ্রের ছেলেবেলাতে তাঁদের বাড়ীতে অনেকগুলি ছেলে থাকতো। এদের সবাই ছিল অনাথ। প্রকাশচন্দ্রই সেই অনাথ ছেলেদের ভরণপোষণ করতেন। তিনি তাদের ঠিক নিজের ছেলের মতোই আদর-যত্ন করতেন। নিজের ছেলেদের যে রকম পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে দিতেন, তাদের জন্যও ঠিক সেই রকম পোশাক-পরিচ্ছদই আসতো। খাওয়া, থাকা, পোশাক-পরিচ্ছদ—সব দিক দিয়েই তারা বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে সমান ছিল। ঐ অনাথ ছেলেদের সঙ্গে সমান সমান ভাবে মেলামেশার দরুণ ছেলেবেলা থেকেই বিধানচন্দ্রের মনে গরীবের প্রতি একটা একাত্মভাবের সৃষ্টি হয়। উত্তর-জীবনে এই কারণেই তিনি কখনও গরীবকে ঘৃণা করেন নি।

এমনও দেখা গেছে যে, তিনি কোন গরীবের বাড়ীতে চিকিৎসা করতে গিয়ে ভিজিট তো নেনই নি—এমন কি, নিজের পয়সা দিয়ে তাদের ঔষধ-পত্র ও পথ্য কিনবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বিধানচন্দ্রের এই পরোপকার-প্রবৃত্তির মূলে তাঁর মায়ের

অবদান অনেকখানি। অঘোরকামিনী দেবী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী হয়েও প্রতিবেশীদের বিপদ-আপদের কথা শুনলেই তাদের বাড়ীতে ছুটে যেতেন। কারো বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোকের প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়েছে শুনলেও তিনি সেখানে ছুটে যেতেন ও নানাভাবে তাদের সাহায্য করতেন।

এই রকম একটা ঘটনার কথা বিধানচন্দ্রের আজও মনে আছে। তিনি তখন খুবই ছোট। রাত তখন প্রায় দুটো। এই সময় কাছাকাছি একটা বাড়ী থেকে একজন লোক এসে ডাকাডাকি করে তাঁর মাকে তুলে বললো যে, তাদের বাড়ীতে একটি বউয়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে।

এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই অঘোরকামিনী দেবী একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে সেই লোকটির সঙ্গে তাদের বাড়ীতে চলে গেলেন।

তারপর সারারাত সেই বাড়ীতে থেকে বউটির প্রসব হবার পর তিনি ফিরে আসেন। তখন সকাল হয়ে গেছে।

মায়ের এই পরোপকার-প্রবৃত্তি বিধানচন্দ্রের মনে খুব গভীরভাবে দাগ কাটে। সেই বয়সেই তিনি বুঝে নেন যে, কেউ কোন বিপদে পড়লে সেখানে ছুটে যাওয়া দরকার।

নিজের ভাইদের মধ্যে সাধনচন্দ্রের সঙ্গেই বিধানের

ভাব ছিল বেশী। কারণ তিনি ছিলেন বিধানচন্দ্র থেকে মাত্র আড়াই বৎসরের বড়। সুতরাং দাদা হলেও তিনি এক রকম বিধানচন্দ্রের খেলার সাথীই ছিলেন। বড়দা সুবোধচন্দ্র ছিলেন বিধানচন্দ্রের চেয়ে চার বৎসরের বড়।

পাঠশালাতেও সাধন আর বিধান এক সঙ্গেই পড়াশুনা করতেন।

তখন তাঁরা ছিলেন বিহারে, অবশ্য বাংলা ভাষাতেই লেখাপড়া শিখবার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন।

পাঠশালায় পড়া শেষ হলে সাধন আর বিধান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সে সময় বিহারে এখনকার মতো প্রাইমারী স্কুল ছিল না।

বিধানচন্দ্রের বিষের ভয় সম্বন্ধে একটা চমৎকার কাহিনী আছে। তাঁর মা একবার তাঁর নিজের ছেলেবেলার গল্প করবার সময় বলেছিলেন যে, একদিন একটা কুল খেয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। কুলটা ছিল তেতো। তেতো কুলের কথা শুনেই তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা বলে উঠলেন যে, ওটা সাপে খাওয়া কুল। সাপের বিষে কুলটা তেতো হয়ে গেছে।

এই কথা শুনবার পরই অঘোরকামিনী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন সকলে মিলে তাঁকে লবণজল আর চালধোয়া জল খাইয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন।

কথাটা বিধানচন্দ্রের মনের ওপরে দাগ কেটেছিল। কিছুদিন পরে তাঁরা পাঁচ ভাইবোন মিলে খেতে বসেছেন। খাবার শেষে দেওয়া হ'ল আম। একটুকরো আম তুলে মুখে দিতেই বিধানচন্দ্রের মনে হ'ল যে, সেটা যেন একটু তেতো।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে পড়ে গেল মায়ের সেই তেতো কুলের গল্পের কথা। তাঁর মনে হ'ল, তেতো আমটাও নিশ্চয়ই সাপে খাওয়া। সাপের বিষের জন্যই আমটাও তেতো হয়ে গেছে।

এই কথা মনে হতেই তিনি উঠে গিয়ে বমি করতে চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তাড়াতাড়ি লবণজল আর চালধোয়া জল আনতে চললেন।

কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে ওঠেন যে, তিনি বিষাক্ত আম খেয়েছেন। আমটা তেতো। সুতরাং নিশ্চয়ই ওটা সাপে খাওয়া।

এদিকে ঐ একই আম কেটে সবাইকেই দেওয়া



বিধানচন্দ্র (১৯১১)

হয়েছিল। বিধানচন্দ্রের কথা শুনে তাঁর দাদাদেরও মনে হ'ল যে, সত্যিই আমটা যেন একটু তেতো তেতো। তাঁরাও তখন চীৎকার করতে আরম্ভ করলেন—বিষাক্ত আম খেয়ে মারা গেলাম, শীগ্‌গির লবণজল আনো।

ছেলেদের চীৎকার শুনে প্রকাশচন্দ্র ছুটে এলেন সেখানে। তিনি এসে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—বিষাক্ত আম।

বিষাক্ত আম মানে ? জিজ্ঞাসা করলেন প্রকাশচন্দ্র।

পিতার প্রশ্নে বিধানচন্দ্র সব কিছু খুলে বললেন তাঁর কাছে।

সব শুনে প্রকাশচন্দ্র বললেন—কে বললে আম বিষাক্ত ? এই দেখ আমি তোমাদের সামনেই আমের বাকি অংশটা খেয়ে নিচ্ছি।

এই বলে সত্যি সত্যিই তিনি আমের বাকি অংশটা খেয়ে ফেললেন।

পিতার কিছুই হচ্ছে না দেখে ছেলেরা আশ্চর্য হয়ে গেল।

প্রকাশচন্দ্র তখন বুঝিয়ে দিলেন যে, আসলে ওটা তাদের মনের সন্দেহ। সন্দেহ থেকেই তেতো মনে হয়েছে আমটা।

স্কুলের ছাত্রাবস্থায় বিধানচন্দ্রের জীবনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানা যায় না। যে কোন সাধারণ ছেলের মতোই তিনি লেখাপড়া করতেন।

তবে এই সময় তাঁদের স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হ'ত বাড়ীতে। প্রকাশচন্দ্র ছেলেদের নিয়ে বাড়ীর অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। তাঁদের পালা করে বাসন মাজা, জল তোলা এবং ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ করতে হ'ত। এটা ছিল বাধ্যতামূলক। ক্রমে এটা ছেলেদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

ফুটবল খেলতে বিধানচন্দ্র খুব ভালবাসতেন। স্কুল-জীবনে এই ফুটবল খেলাই ছিল তাঁর প্রধান আনন্দ।

এই রকম সাধারণ ভাবেই তাঁর স্কুলের পড়া শেষ হয়। যথাকালে তিনি এণ্ট্রান্স পাস করে কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন।

মেডিক্যাল কলেজে

বি. এ. পাস করা পর্যন্ত বিধানচন্দ্রের জীবনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। সাধারণ গতানুগতিক ভাবেই তিনি এফ. এ. ও বি. এ. পাস করেন। বি. এ. পাস করার পর কোন বিশেষ বিভাগে শিক্ষালাভ করবেন বলে আগে থেকে কিন্তু স্থির করে রাখেন নি তিনি। তবে বিধানচন্দ্রের পিতা এ ব্যাপারে ছেলেদের ইচ্ছামত পথ বেছে নেবারই পক্ষপাতী ছিলেন। বিধানচন্দ্র কোন্ লাইনে যাবেন আগে থেকে কিছু স্থির না থাকায় তিনি মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ— দু' জায়গাতেই ভর্তি হবার জন্য দরখাস্ত করেন।

কিন্তু তিনি ডাক্তার হন এটাই বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল। কারণ মেডিক্যাল কলেজ থেকেই তাঁর দরখাস্তের মঞ্জুরীপত্র আগে আসে।

মঞ্জুরীপত্র পাবার পর তিনি যেদিন মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ফীর টাকা দাখিল করে আসেন, সেইদিনই বিকালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে বলে

খবর আসে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যদি ঐ মঞ্জুরীপত্র পেতেন, তাহলে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই তিনি ভর্তি হতেন।

যাই হোক, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন বলেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আর তিনি ভর্তি হলেন না। এই ভাবেই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার ভাগ্যচক্রে সেদিন মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বিধানচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পরে ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করেন বিধানচন্দ্র। আবাল্য বাংলার বাইরে থাকায় কলকাতার ছেলেদের থেকে তিনি যেন বেশ একটু পিছিয়ে আছেন বলে তাঁর মনে হয়। তা ছাড়া তাঁর অন্য একটি অসুবিধা ছিল এই যে, তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুবই খারাপ।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি প্রথমে ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে বাস করতে থাকেন, কিন্তু কিছু-দিন পরেই সেখান থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজের হোস্টেলে চলে যান। প্রেসিডেন্সী কলেজ হোস্টেলের যে

ঘরে তিনি সিট পান, সেই ঘরে মেডিক্যাল কলেজের আর একজন ছাত্র বাস করতেন।

ঐ ছাত্রটি রাতের বেলায় ঘরের সব জানালা খুলে দিতেন। এতে বিধানচন্দ্রের খুবই অসুবিধা হ'ল। খোলা হাওয়া তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি সেই ছাত্রটিকে অনুরোধ করলেন, জানালা বন্ধ করে দিতে। ছাত্রটি কিন্তু তাঁর কথায় কান দিলেন না। ফলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হ'ল বিধানচন্দ্রের।

এতেও কিন্তু সেই ছাত্রটি জানালা বন্ধ করবার দরকার বোধ করলেন না। ফলে বিধানচন্দ্রের প্রায়ই জ্বর হ'তে লাগলো।

কিন্তু ক্রমে তাঁর ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য হয়ে এলো। জ্বর হওয়াও বন্ধ হ'ল। এ ব্যাপারে বিধানচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে, শরীরকে যা সহানো যায় তাই সে সহ্য করতে পারে।

মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বৎসর বেশ ভাল ভাবেই কাটলো তাঁর। টাকা-পয়সার দিক দিয়েও কোন রকম অসুবিধায় পড়তে হ'ল না তাঁকে। কিন্তু বিপদ বাধলো দ্বিতীয় বৎসর থেকে। এই বৎসর থেকে তাঁর পিতা তাঁকে প্রয়োজনীয় টাকা দিতে পারতেন না। কারণ তিনি তখন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তাঁর

বড় দুই ছেলে তখন বিলাতে পড়াশুনা করছেন, তাঁদের কাছেও টাকা পাঠাতে হ'ত তাঁকে। এই সব কারণেই বিধানচন্দ্রকে তিনি প্রয়োজনীয় টাকা পাঠাতে পারতেন না।

বিধানচন্দ্র পড়লেন মহা বিপদে। টাকার অভাবে তিনি দিশেহারা হয়ে যাবার মতো হলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তিনি একটা [illegible]য়ে যান। এই বৃত্তি না পেলে তাঁর হয়তো মেডিক্যাল কলেজে পড়াই হ'ত না তখন।

কিন্তু এই বৃত্তির টাকাতে তাঁর সমস্ত খরচ কুলাতো না। খাওয়া, থাকা আর কলেজ ফী দিয়ে বই কিনবার মতো টাকা তাঁর হাতে থাকতো না।

একটা খুব বিস্ময়ের কথা এই যে, মেডিক্যাল কলেজে পড়বার দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিধানচন্দ্র শুধু একখানি মাত্র ডাক্তারী বই পাঁচ টাকা দিয়ে কিনতে পেরেছিলেন! বাকি বইগুলি তিনি লাইব্রেরী থেকে নিয়ে বা সহপাঠীদের কাছ থেকে দু'-চার দিনের জন্য চেয়ে নিয়ে পড়েছিলেন।

লেখাপড়ায় বিধানচন্দ্রের অখণ্ড মনোযোগ ছিল, তাই শত অভাবও তাঁর শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

যে কাজ তিনি যখন করতেন, তখন সেই কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে যেতেন।

তাঁর অখণ্ড মনোযোগের একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে। একদিন তিনি যখন শব-ব্যবচ্ছেদ কক্ষে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করতে ব্যস্ত, এই সময় কলেজের অধ্যক্ষ জেনারেল বমফোর্ড আসেন সেখানে। অধ্যক্ষকে দেখেই অন্য ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিধানচন্দ্র কিন্তু তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না, আপন মনে কাজ করে চলেন। জেনারেল বমফোর্ড তখন তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন—তুমি বুঝি খুব ভাল ছাত্র ?

অধ্যক্ষের এই প্রশ্নে বিধানচন্দ্র বিব্রত হয়ে তাকান তাঁর দিকে। কি উত্তর দেবেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

তাঁর এই বিব্রত ভাব দেখে জেনারেল হেসে বলেন—তোমার কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি বাপু !

জেনারেল বমফোর্ডের সেদিনের সেই কথাটি বিধানচন্দ্র আজীবন মনে রেখেছেন।

আর একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন বিধানচন্দ্রের। তাঁর নাম কর্নেল লুকিস। তিনি ছিলেন কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ।

এই লুকিস সাহেবই ছিলেন বিধানচন্দ্রের যাবতীয় উন্নতির মূল। যখনই বিধানচন্দ্র কোন বিপদে পড়েছেন, কর্নেল লুকিস এগিয়ে এসে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন তাঁকে।

তাঁকে তিনি নিজের ছেলের মতো স্নেহ করতেন। বহু বার তিনি তাঁকে ইংরেজ ডাক্তারদের রোষানল থেকে রক্ষা করেছেন। বিধানচন্দ্রের পিছনে লাগতে গিয়ে অনেক ইংরেজ ডাক্তার কর্নেল লুকিসের কাছে অপমানিত পর্যন্ত হয়েছেন।

বিধানচন্দ্র কর্নেল লুকিসকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রোগী দেখবার ঘরে কর্নেলের একখানি বৃহৎ ছবি দেখে।

কর্নেল লুকিস ছিলেন প্রকৃত গুণগ্রাহী ইংরেজ। তিনিই বিধানচন্দ্রকে একদিন বলেছিলেন—জানো বিধান, তুমি যদি কোন ইংরেজের কাছে তোমার মাথা এক ইঞ্চি নত করো, সে তখন তোমার শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। সুতরাং সব সময়ই তোমার মাথা উঁচু রাখবে।

কর্নেল লুকিসের এই উপদেশ বিধানচন্দ্র কোনদিন ভোলেন নি।

একদিন একটা ঘটনার কথা বলছি। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের



কবি রবীন্দ্রনাথ ও ডাঃ রায়

কথা। সেদিন বিধান ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠী বর্ধমান থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট ছিল তাঁদের কাছে। গাড়ীতে উঠে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী গাড়ীর হু'খানা বেঞ্চ দখল করে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আর তাঁরা শুয়ে থাকার জন্যে অনেক লোক বসতে না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিধান তখন সোজা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললেন—উঠে বসুন।

সাহেব প্রতিবাদ করতেই বিধান দৃঢ়স্বরে বললেন—আপনাদের অবশ্যই উঠে বসতে হবে।

বিধানের দৃঢ়তাব্যঞ্জক মনোভাব দেখে আর আদেশের মতো স্বর শুনে সাহেব আর মেম সাহেব শুড় শুড় করে উঠে বসলেন।

সাহেবদের সঙ্গে বিধানচন্দ্র সমান সমান ব্যবহার করলেও তাঁর মনটা ধীরে ধীরে সাহেবি-আনার দিকে ঝুঁকে পড়লো। ক্রমে তিনি সব রকমে সাহেবদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁর সেই সাহেব হওয়ার নেশা এমনই উৎকট হয়ে

উঠেছিল তখন যে, নিজের নামও তিনি ইংরেজের মতো করে লিখতেন সময় সময়। B. C. Royকে তিনি লিখতেন বেঞ্জামিন চার্লস্ রায়!

পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন থেকে এই সাহেব হবার ইচ্ছা দূর হয়ে যায়।

ছাত্রজীবনে বিধানচন্দ্রের সৎসাহসের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন তিনি কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, এই সময় দেখতে পেলেন যে, একখানা ব্রুহাম গাড়ীর সঙ্গে চলন্ত ট্রামের সংঘর্ষ হ'ল। ব্রুহাম গাড়ীখানা ট্রাম-চালকের ঘণ্টাধ্বনির নির্দেশ অমান্য করেই হঠাৎ বেঁক নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দিকে আসতে চেষ্টা করে।

সেই গাড়ীর আরোহী ছিলেন কর্নেল পেক্। ইনি ছিলেন মিড্ওয়াইফারীর প্রফেসার। তাঁর হয়তো ধারণা ছিল যে, সাহেবের গাড়ী দেখে ট্রামগাড়ী থেমে যাবে। কিন্তু ট্রাম-চালক গাড়ী না থামানোয় এবং ধাক্কা লেগে তাঁর ব্রুহাম ভেঙে যাওয়ায় তিনি ক্ষেপে ওঠেন। গেটের সামনে বিধানচন্দ্রকে দেখে তিনি তাঁকে ডেকে বলেন—তুমি এখানে ছিলে তো! আমি নালিশ করবো, ট্রাম কোম্পানির নামে। তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।

বিধানচন্দ্র অকুতোভয়ে বললেন—আমার সাক্ষ্য আপনার বিরুদ্ধেই যাবে, স্যর।

কর্নেল পেক্ আশ্চর্য হয়ে গেলেন—তার মানে!

বিধান বললেন—মানে, আমি যা দেখেছি আদালতে আমি সেই কথাই বলবো। দোষ আপনারই।

কর্নেল পেক্ তখন চোখমুখ লাল করে বিধানকে শাসিয়ে গেলেন যে, তিনি তাঁকে দেখে নেবেন।

সত্যিই দেখে নিয়েছিলেন তিনি। এমন দেখাই তিনি দেখেছিলেন যাতে বিধানচন্দ্রকে এম. বি. পরীক্ষায় ফেল করিয়ে ছাড়েন তিনি। কর্নেল পেক্ ছিলেন মিড্‌ওয়াইফারীর প্র্যাক্‌টিক্যাল্ বিষয়ের পরীক্ষক।

বিধানচন্দ্র তাঁর কাছে পরীক্ষা দিতে যেতেই তিনি চোখ মুখ লাল করে তাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন।

এইভাবে পরীক্ষায় ফেল করায় বিধানচন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং সমস্ত ঘটনার কথা তাঁর প্রিন্সিপাল কর্নেল লুকিসকে বললেন।

কর্নেল লুকিসও খুবই দুঃখিত হলেন এই কথা শুনে। তিনি তখন বিধানচন্দ্রকে এল. এম. এস. পরীক্ষা দিতে বললেন। এম. বি. পরীক্ষার পনের দিন পরেই ছিল

এল. এম. এস. পরীক্ষা। বিধানের মনে হ'ল যে, এ পরীক্ষাতেও কর্নেল পেক্-এর খপ্পরে পড়তে হবে, কারণ এ পরীক্ষাতেও মিড্ওয়াইফারীর প্র্যাক্টিক্যাল্ পরীক্ষক তিনিই।

কিন্তু পরীক্ষা দেবার সময় এবারে তাঁকে আর আগের বারের মতো গরম মেজাজে দেখলেন না বিধান। কর্নেল পেক্ মৃদু হেসে বললেন—আমি ভেবেছিলাম এম. বি. পরীক্ষার পরে তুমি আমার কাছে আসবে। এলে না কেন? তখন এলে আর এই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবার দরকার হ'ত না।

বিধানচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে, এখানেও কর্নেল লুকিসের হাত আছে। তাঁর কথাতেই কর্নেল পেক্ নরম হয়েছেন।

এইভাবে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে এল. এম. এস. পাস করেন বিধানচন্দ্র।

কর্মজীবনের আরম্ভ

এল. এম. এস. পরীক্ষায় পাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ বিধান রায় প্রাদেশিক ডাক্তারী বিভাগের চাকরিতে (Provincial Medical Service) ভর্তি হন। তাঁর প্রথম চাকরি হয় মেডিক্যাল কলেজের সহকারী হাউস-ফিজিসিয়ান পদে।

এই চাকরিতে ভর্তি হবার পরেই কর্নেল লুকিস তাঁকে তাঁর নিজস্ব সহকারী করে নেন।

কর্নেল লুকিস প্রায়ই ডাঃ রায়কে কলেজে লেকচার দিতে পাঠাতেন। এই ভাবে কর্নেল লুকিসের সহায়তায় প্রফেসার না হয়েও তিনি কলেজে লেকচার দিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।

বিধানচন্দ্রকে তখন খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হ'তো। কিন্তু কাজকে তিনি কোনদিনই ভয় করতেন না। কর্তব্য যত কঠিনই হোক, তিনি তা হাসিমুখে পালন করতেন।

হাউস-ফিজিসিয়ানরূপে তিনি যখন হাসপাতালে রুগী দেখতে যেতেন, তখন গতানুগতিকভাবে রুগীর টিকিটে

যা হয় একটা নির্দেশ লিখে দিয়ে কর্তব্য শেষ করতেন না। প্রত্যেক রুগীকে ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র দিতেন। সময় সময় তিনি নিজের হাতে রুগীদের স্নান করিয়ে দিতেন এবং তাদের খাদ্য তৈরি করে দিতেন।

এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি যে, ডাঃ রায় তাঁর ডাক্তারী জীবনে সর্বপ্রথম যে ফী পান, তা হ'ল নগদ দু'টি টাকা মাত্র। পরবর্তী কালে যে বিধান রায়ের বাড়ীতে গিয়ে রোগ পরীক্ষা করাতে হলেও ৬৪৲ টাকা ফী দিতে হ'ত, তাঁর প্রথম রোজগার হ'ল দু' টাকা!

কিন্তু দুই টাকা ফী নিয়েও তিনি যে-রুগীকে চিকিৎসা করতেন, সে রুগী মনে করতো যে, আর তার ভয় নেই।

চিকিৎসকরূপে অর্থ উপার্জনের ব্যাপারেও কর্নেল লুকিস ডাঃ রায়কে প্রথম থেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সুযোগ পেলেই তিনি ডাঃ রায়ের গুণাবলী ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করতেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসাবে বিধান রায় বেশ নাম করে ফেলেন। তাঁর রুগীর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে।

হাউস-ফিজিসিয়ান পদে ডাঃ রায় দুই বৎসর কাজ করেন। এই দুটি বৎসর তিনি অন্যান্য হাউস-ফিজিসিয়ানদের মতো শুধু হাসপাতালের কর্তব্য পালন করেই দায়মুক্ত হননি; কাজের ফাঁকে ফাঁকে এম. ডি. পরীক্ষার জন্যেও তৈরী হতে থাকেন।

তখন তাঁকে দৈনিক সতের ঘণ্টা থেকে আঠার ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়েছে। হাউস-ফিজিসিয়ান পদে কাজ করে তিনি যে মাসিক বেতন পেতেন তার পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। মাসে মাত্র ৯৯৷৶০ বেতন ছিল তাঁর।

এই সামান্য টাকা থেকেই তাঁকে সব খরচ চালাতে হতো। শুধু তাই নয়, ঐ টাকা থেকে তিনি মাসে মাসে কিছু জমিয়েও রাখতেন—বিলাতে গিয়ে পড়বার খরচ চালানোর জন্যে। উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলাতে যাওয়ার কথা ডাঃ রায় তখন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

কিন্তু বিলাতে যাবার আশা মনে মনে পোষণ করলেও সেখানে গিয়ে কিসে ভর্তি হবেন, সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারেন নি তিনি।

সে সময় ডাক্তারী পড়বার জন্য যাঁরা বিলাতে যেতেন, তাঁদের বেশির ভাগই যেতেন আই. এম. এস. পরীক্ষা দিতে। কারণ আই. এম. এস. হয়ে আসতে পারলেই

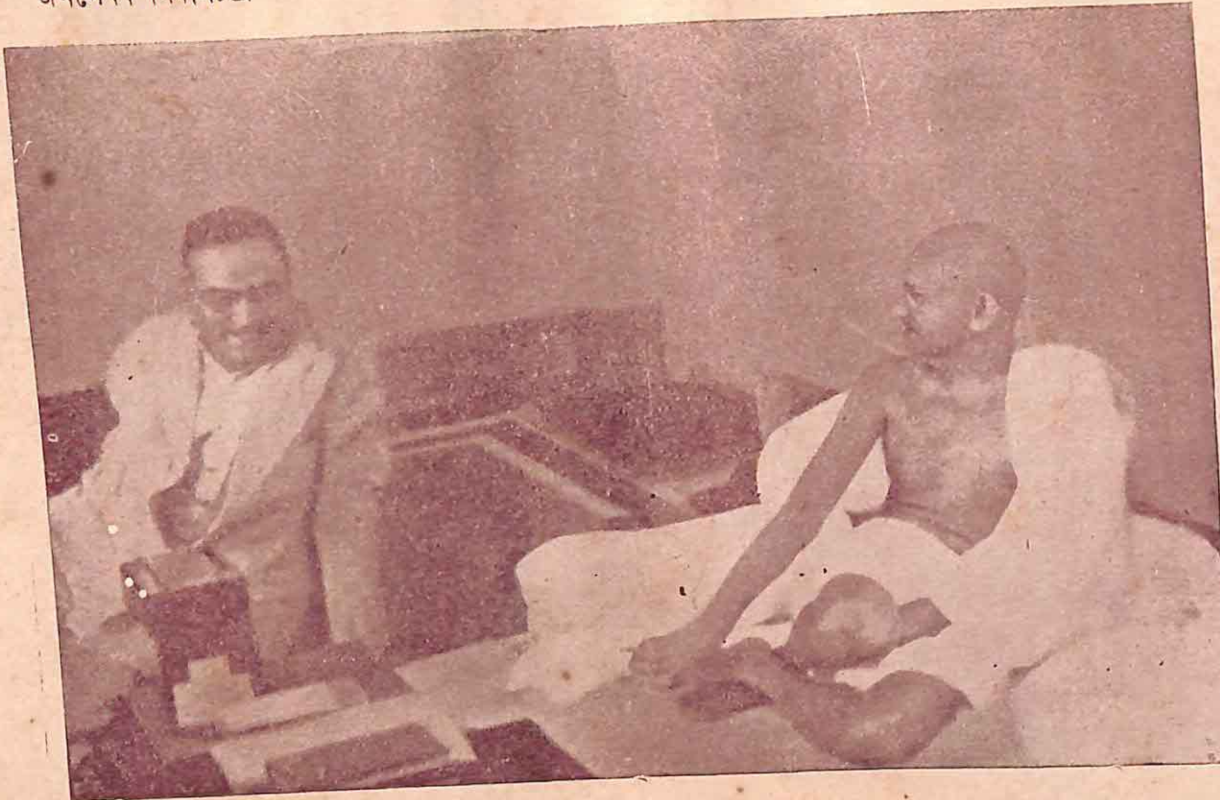
সিভিল সার্জনের পদ পাওয়া যেত। তাছাড়া উচ্চতর পদে উন্নীত হবার সম্ভাবনাও আই. এম. এস.-দের খুব বেশী ছিল। এই সব কারণেই বিলাতে যাঁরা ডাক্তারী পড়তে যেতেন, তাঁরা আই. এম. এস. হওয়াটাকেই কাম্য মনে করতেন।

ডাঃ রায়ের মনেও প্রথমে যে আই. এম. এস. হবার আকাঙ্ক্ষা না ছিল এমন নয়, কিন্তু কর্নেল লুকিসই তাঁকে আই. এম. এস. হতে নিষেধ করেন।

তিনি নিজে একজন পদস্থ আই. এম. এস. অফিসার; তাই আই. এম. এস.-দের দোষ-ত্রুটি খুব ভাল করেই জানতেন। তাঁর মত ছিল এই যে, আই. এম. এস.-রা ভাল ডাক্তার হ'তে পারেন না। কারণ সরকারী চাকরির আরাম-চেয়ারে বসে আর মাসে মাসে মোটা মাইনে পকেটস্থ করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা ডাক্তারী ব্যাপারে উদাসীন হয়ে থাকেন। তাঁদের যা কিছু ক্ষমতা আর ডাক্তারী জ্ঞান, সবই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় সরকারী দপ্তরের ফাইল আর কাগজপত্রের ভিতর। সদর হাসপাতাল পরিদর্শন, জেল হাসপাতালে হাজিরা এবং মাঝে মাঝে সরকারী টি. এ.-তে মফস্বলের হাসপাতাল পরিদর্শন—এই হ'ল আই. এম. এস. সিভিল সার্জনদের কাজ।

এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা কর্নেল লুকিস খুব ভাল-

জনসেবক বিধানচন্দ্র—



গান্ধীজীর সঙ্গে বিধান রায়

ভাবে জানতেন বলেই তিনি ডাঃ রায়কে আই. এম. এস. হতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁকে পরামর্শ দেন যে, বিলাতে যদি যেতেই হয়, তাহলে ওখান থেকে এফ্. আর. সি. এস. আর এম. আর. সি. পি. পাস করে সত্যিকারের ডাক্তার হয়ে আসা উচিত।

সত্যি কথা বলতে কি, ডাঃ রায়েরও আই. এম. এস. অফিসারদের সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা ছিল না। মেডিক্যাল কলেজে চাকরি করবার সময় কয়েকজন আই. এম. এস. সাহেবের সঙ্গে ডাঃ রায়ের অনেকবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। অবশ্য প্রতিবারই তিনি কর্নেল লুকিসের হস্তক্ষেপের ফলে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন।

এমনি দু'একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি এখানে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল তিনি যেদিন প্রথম হাউস-ফিজিসিয়ান হয়ে মেডিক্যাল কলেজে যোগ দিয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনটিতেই।

বিকালে ডাঃ রায় হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো দেখছিলেন। অনেকগুলো ওয়ার্ড দেখা হয়ে গেলে তিনি গেলেন ইয়োরোপীয়ান ফিমেল ওয়ার্ডে।

হাসপাতালের কাজকর্ম কি ভাবে চলে, সে সম্বন্ধে তাঁর খুব পরিষ্কার ধারণা তখন ছিল না।

ফিমেল ওয়ার্ডের নার্স তাঁকে বললো যে, ঐ দিনই বিকালে একজন ইহুদী মহিলাকে ভুল করে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। নার্স আরও বললো যে, ইহুদী মহিলাদের জন্য 'এজরা হাসপাতাল' নামে মেডিক্যাল কলেজের ভিতরেই আলাদা হাসপাতাল আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মহিলাকে অতিরিক্ত (Extra) বেড দিয়ে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

ডাঃ রায় তখন সেই মহিলার ভর্তি-টিকিট দেখতে চান। টিকিট পরীক্ষা করে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে, সত্যিই ভুল করে মহিলাটিকে এ ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার টিকিটের ওপরে লিখেছিলেন—"Admit Ezra" অর্থাৎ এজরা হাসপাতালে ভর্তি করা হোক; কিন্তু কর্মচারীরা কথাটিকে পড়ে—"Admit Extra" বলে—এবং এই কারণেই মহিলাটিকে অতিরিক্ত (Extra) বেড দিয়ে ঐ ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

ডাঃ রায় নার্সকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে কি করতে হবে জানতে চান।

নার্স তখন ডাঃ রায়কে বলে যে, ঐ মহিলার টিকিটে —"Transfer to Ezra Hospital—By order" —এই কথাগুলো লিখে নাম সই করে দিতে হবে।

ডাঃ রায় তাই করলেন।

এরপর তিনি ওখান থেকে অন্য ওয়ার্ডে চলে যান।

কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন ওয়ার্ড দেখে ফিরে আসছেন, সেই সময় একটি ছাত্র তাঁকে বলে যে, ক্যাপ্টেন আরুইন ইয়োরোপীয়ান ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়ে তাঁর অর্ডার কেটে দিয়ে এসেছেন।

ক্যাপ্টেন আরুইন ছিলেন হাসপাতালের রেসিডেণ্ট-সার্জন।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে, ডাঃ রায় ইয়োরোপীয়ান ফিমেল ওয়ার্ড থেকে চলে আসবার পরেই আগের সেই নার্সের ডিউটি বদল হয়ে যায়। তার জায়গায় অন্য নার্স আসে।

এদিকে তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। নূতন নার্স এসে রুগীকে স্থানান্তর করার হুকুম দেখেই মনে মনে বিরক্ত হয়। বিরক্ত হবার কারণ এই যে, সন্ধ্যার সময় রুগীকে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হলে অনেক ছুটাছুটি করতে হয়।

এই সময় ক্যাপ্টেন আরুইন সেই ওয়ার্ডে যান। নার্সটি তখন তাঁকে বলে যে, ডাঃ রায় এসে অন্যায়ভাবে একটা হুকুম দিয়ে গেছেন।

ক্যাপ্টেন আরুইন ব্যাপারটা ভাল করে না দেখেই নার্সের কথামত ডাঃ রায়ের লেখা অর্ডারটা কেটে তার নীচে নিজের নাম সই করে দেন।

পরদিন সকালে ডাঃ রায় আবার সেই ওয়ার্ডে যান। তিনি দেখতে পান যে, ছাত্রটি যে কথা বলেছিল তাই ঠিক। সত্যিই ক্যাপ্টেন আরুইন তাঁর অর্ডার কেটে দিয়েছেন।

এতে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তিনি তখন সোজা চলে যান কর্নেল লুকিসের কাছে। তাঁর কাছে গিয়েই বলেন যে, হাসপাতালে কাজ করা বোধ হয় তাঁর হবে না।

কর্নেল লুকিস কারণ জিজ্ঞাসা করলে ডাঃ রায় সব কথা খুলে বলেন তাঁকে।

ডাঃ রায়ের কাছে সব কথা শুনে কর্নেল লুকিস রেগে আগুন হয়ে তখুনি ক্যাপ্টেন আরুইনকে ডেকে পাঠান।

ক্যাপ্টেন আরুইন এলে ডাঃ রায়ের সামনেই কর্নেল লুকিস তাঁকে যাচ্ছেতাই অপমান করেন। তিনি বলেন যে, ডাঃ রায় তাঁর সহকারী, সুতরাং ডাঃ রায়ের প্রত্যেকটি অর্ডারকে তাঁর নিজের অর্ডার বলে মেনে নিতে হবে। তাছাড়া হাসপাতালের কর্তা তিনি; ক্যাপ্টেন আরুইন

নন ; সুতরাং ভবিষ্যতে তিনি যেন সাবধান হয়ে কাজ-কর্ম করেন।

ক্যাপ্টেন আরুইন অপমানিত হয়ে মাথা নীচু করে চলে যান সেখান থেকে।

এরপর ক্যাপ্টেন আরুইন আর একবার বিধানচন্দ্রকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করেন। হাসপাতালের সহকারী ডাক্তারদের সম্বন্ধে কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট লিখতেন তিনি। ডাঃ রায়ের সম্বন্ধে তিনি যা-তা মন্তব্য লিখে গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠান।

কিন্তু প্রত্যেকটি কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টই কর্নেল লুকিসের সই হয়ে তার পরে গভর্নমেণ্টের কাছে যেতো।

ডাঃ রায়ের সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন আরুইনের সেই রিপোর্ট পড়ে কর্নেল লুকিস অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি তখন নিজের হাতে সে রিপোর্ট কেটে তার পরিবর্তে তাঁর নিজের মতামত লিখে দেন।

দ্বিতীয় সংঘর্ষটি হয় ক্যাপ্টেন মেগোর সঙ্গে। তিনি ছিলেন রেসিডেণ্ট-ফিজিসিয়ান।

একদিন কর্নেল লুকিস বিভিন্ন ওয়ার্ডে রুগী দেখছিলেন। ডাঃ রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

জেনারেল ওয়ার্ডে একটি রুগীর কাছে এসে তার

টেম্পারেচার চার্ট দেখে কর্নেল লুকিস ডাঃ রায়কে বললেন —"রায়, এখনই এর রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা কর। যদি ম্যালেরিয়ার বীজাণু পাও, সঙ্গে সঙ্গে কুইনাইন দেবে।"

কর্নেলের নির্দেশে ডাঃ রায় তখনই কাজে লেগে গেলেন। তখনকার দিনে রক্ত পরীক্ষার ব্যাপারটা এখনকার মতো সহজ ছিল না। তাই ডাঃ রায় নিজে রক্ত পরীক্ষা করলেন।

এর কিছুক্ষণ পরে ডাঃ রায় যখন সেই রুগীকে কুইনাইন ইনজেকসন দিতে গেলেন, তখন হাসপাতালের রেসিডেণ্ট-ফিজিসিয়ান ক্যাপ্টেন মেগো সেই ওয়ার্ডে এসেছেন।

ডাঃ রায়ের হাতে কুইনাইনের এম্প্যুল আর ইনজেকসনের সিরিঞ্জ দেখে ক্যাপ্টেন মেগো তাঁকে কুইনাইন দিতে নিষেধ করলেন।

তিনি বললেন যে, 'এশিয়াটিক ফিভার'-এর প্রকৃতি জানবার জন্যে সেই রুগীকে তিনি পরীক্ষাধীনে রেখেছেন; সুতরাং তাকে যেন কুইনাইন ইনজেকসন না দেওয়া হয়।

উপরস্থ কর্মচারীর নির্দেশে ডাঃ রায় কুইনাইন ইনজেকসন না দিয়েই ফিরে গেলেন।

এরপর কর্নেল লুকিসের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি

জিজ্ঞাসা করলেন, "রুগীকে কুইনাইন দেওয়া হয়েছে তো?"

ডাঃ রায় তখন ক্যাপ্টেন মেগোর নির্দেশের কথা জানিয়ে দিয়ে বললেন যে, উপরস্থ কর্মচারীর নির্দেশে তিনি কুইনাইন ইনজেকসন দেওয়া বন্ধ রেখেছেন।

এই কথা শুনে কর্নেল লুকিস রেগে আগুন হয়ে তখুনি ক্যাপ্টেন মেগোকে ডেকে পাঠালেন এবং একদল ছাত্রের সামনেই তাঁকে কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে আরও বললেন যে, ভবিষ্যতে ক্যাপ্টেন মেগো যেন ডাঃ রায়ের কোন কাজে বাধা সৃষ্টি না করেন।

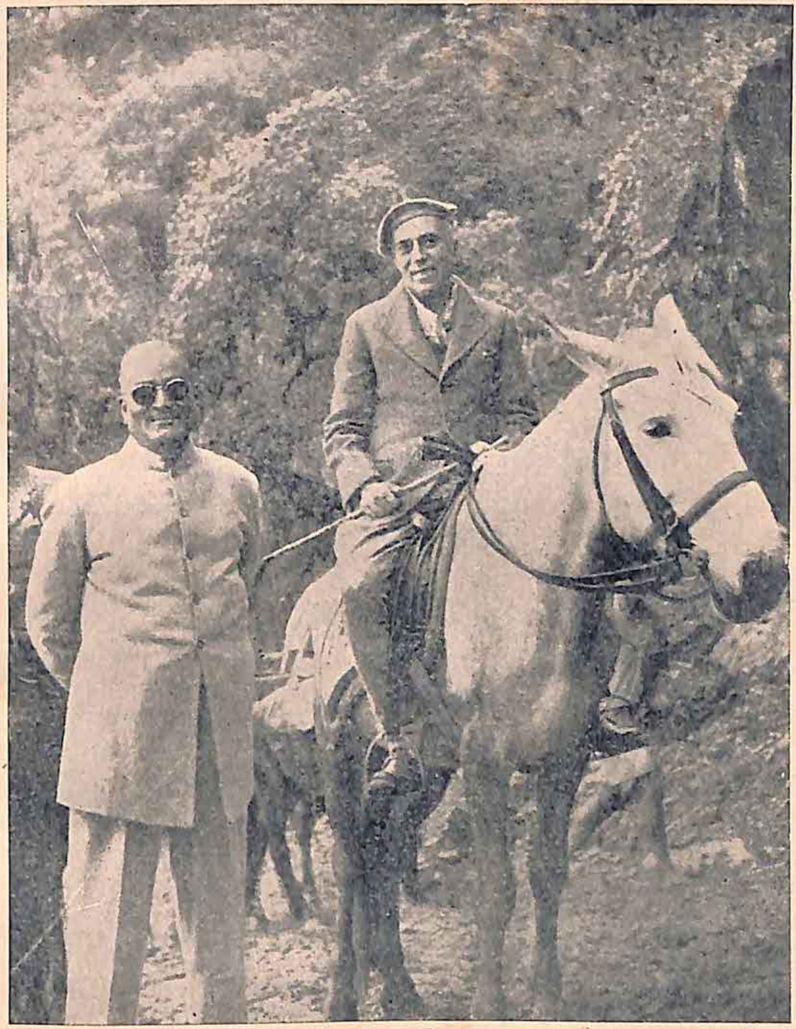
ছাত্রদের সামনে ঐ ভাবে অপমানিত হয়ে ক্যাপ্টেন মেগো মাথা নীচু করে চলে গেলেন।

পরে সেই ক্যাপ্টেন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর-জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন; কিন্তু সেদিনের সেই অপমানের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁকে জব্দ করবার জন্যেই ডাঃ রায় সেদিন কর্নেল লুকিসের কাছে অভিযোগ করেছিলেন।

মাত্র দু'টি বৎসর বিধান রায় মেডিক্যাল কলেজে চাকরি করেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই বহু বার তাঁর সঙ্গে সাহেব ডাক্তারদের মতানৈক্য ও সংঘর্ষ হয়।

এদিকে হাসপাতালের চাকরি করতে করতেই তিনি এম. ডি. উপাধি লাভের জন্যে তৈরী হলেন। যথাসময়ে তাঁর থিসিস্ (গবেষণার বিষয়) গৃহীত হয় এবং তিনি এম. ডি. উপাধি লাভ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. উপাধি লাভ করবার পরই তাঁর বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা হয়। কর্নেল লুকিসের উপদেশ অনুসারে তিনি এফ্. আর. সি. এস. ও এম. আর. সি. পি. পরীক্ষা দিতে বিলাত যাবেন স্থির করেন।



ডাঃ রায় ও পণ্ডিত নেহেরু

বিলাত যাত্রা

গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে তুই বৎসর তিন মাসের ছুটি নিয়ে বিধানচন্দ্র বিলাত যাত্রার জন্যে তোড়জোড় আরম্ভ করেন।

বিলাতগামী পরবর্তী জাহাজে স্থান সংগ্রহের জন্যে তিনি জাহাজ কোম্পানির অফিসে টেলিফোন করেন। জাহাজ অফিস থেকে বলা হয় যে, তাঁর জন্যে একটি বার্থ নির্দিষ্ট করে রাখা হবে।

এরপর পাসপোর্ট যোগাড় করে তিনি যখন জাহাজ কোম্পানিতে ভাড়ার টাকা জমা দিতে যান, তখন সেখানকার ইংরেজ ম্যানেজার বলেন যে, তু'টি বার্থের ভাড়া না দিলে তাঁকে জাহাজে স্থান দেওয়া সম্ভব হবে না।

ডাঃ রায় এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সেই ইংরেজ ম্যানেজার বলেন যে, তাঁর সঙ্গে একই কেবিনে কোন ইংরেজ যাত্রী যেতে রাজী হবেন না; সুতরাং হয় তাঁকে তু'টি বার্থের ভাড়া দিতে হবে, না হয় আর একজন ভারতীয় যাত্রী যোগাড় করতে হবে।

ডাঃ রায় বলেন যে, ও-তুটোর একটিও তাঁর দ্বারা সম্ভব

হবে না। তাছাড়া বর্ণ-বৈষম্যমূলক সেই ব্যবস্থারও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ম্যানেজার বলেন যে, বিলাতে হেড অফিস ঐরকম নিয়ম করে দিয়েছে; তিনি সে নিয়ম ভাঙতে পারেন না।

ডাঃ রায় তখন মনের দুঃখে সেখান থেকে ফিরে এসে আবার কর্নেল লুকিসের শরণাপন্ন হ'ন। এবারেও কর্নেল লুকিস তাঁকে সাহায্য করেন। তিনি নিজে জাহাজ কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ডাঃ রায়ের বার্থের ব্যবস্থা করে দেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি 'সিটি অব গ্লাসগো' জাহাজে বিধানচন্দ্র বিলাতের পথে যাত্রা করেন।

মার্চ মাসের শেষের দিকে ডাঃ রায় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করেন। কলকাতা থেকে কর্নেল লুকিস এবং আরও কয়েকজন প্রফেসার সেণ্ট বার্থোলোমো হাসপাতালের ডিনের (Dean of St. Bartholomew) নামে কয়েকখানা পরিচিতি-পত্র দিয়েছিলেন।

ওখানকার ডিন তখন ডাঃ শোরে।

বিধানচন্দ্র লণ্ডনে পোঁছেই ডাঃ শোরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর ইনস্টিটিউটে ভর্তি হবার ইচ্ছা জানান।

ডাঃ শোরে কিন্তু বিধানচন্দ্রকে আমলই দিলেন না। তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে, ওখানে ডাঃ রায় ভর্তি হতে পারবেন না।

ডাঃ শোরের এই প্রত্যাখ্যানে বিধানচন্দ্র সেদিন বেশ কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরে এলেন তাঁর কাছ থেকে।

কিন্তু প্রথম দিন হতাশ হলেও হাল ছাড়লেন না ডাঃ রায়। তিনি দু-তিন দিন পর পর একবার করে দেখা করতে লাগলেন ডিনের সঙ্গে।

ডাঃ রায়ের আগ্রহ দেখে অবশেষে ডিন একদিন ভর্তি ক'রে নিলেন তাঁকে। ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেলেন তিনি।

দুই বৎসর শিক্ষালাভ করবার পর যখন ডাঃ রায় ডাক্তারির শ্রেষ্ঠ দু'টি উপাধি পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন, তখন ডাঃ শোরে তাঁকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনন্দন জানান।

শোরে সাহেব বলেছিলেন যে, ডাঃ রায়কে প্রথমে ভর্তি হবার সুযোগ না দিয়ে তিনি অন্যায় করেছিলেন। তিনি এই মন্তব্যও করেছিলেন যে, এতদিন বাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল না।

২

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাঃ রায়কে কথাও দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর চিঠি নিয়ে কোন বাঙালী ছাত্র এলে তাকে তিনি তাঁর ইন্‌স্টিটিউটে ভর্তি করে নেবেন।

ডাঃ শোরের কাছ থেকে এই ভাবে অভিনন্দন লাভ করে ডাঃ রায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন।

তিনি কলকাতায় ফিরে আসবার কয়েক মাস পরেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

পিতার মৃত্যুতে ডাঃ রায় সেদিন শিশুর মতো কেঁদে ছিলেন।

কর্মক্ষেত্রে

বিলাত থেকে ফিরে এসে ডাঃ রায় ৮৪নং হ্যারিসন রোডের বাড়ী ভাড়া করে ডাক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তখনও তিনি সরকারী চাকরিতে ছিলেন। তাই মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কর্নেল ক্যালভার্ট তাঁকে পুলিস কন্স্টেবলদের প্রাথমিক চিকিৎসা (First aid) শিক্ষা দেবার কাজে নিযুক্ত করেন।

এই রকম বাজে কাজ করতে ডাঃ রায়ের মোটেই ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু হাতে টাকা না থাকায় বাধ্য হয়েই তিনি কিছুদিন ঐ কাজ করেন।

বিধানচন্দ্র তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে ছোট একটা চেম্বার সাজিয়ে ফেলেন। ঐ চেম্বারেই তিনি তাঁর চিকিৎসা-কার্য আরম্ভ করেন।

কলকাতায় তখন এম. আর. সি. পি. ও এফ. আর. সি. এস. উপাধিধারী ডাক্তার আর কেউ না থাকায় ডাঃ রায় তাঁর ফী দু' টাকা থেকে বাড়িয়ে আট টাকা করেন।

কিন্তু ফী বাড়ালেও কোন রুগীকে বা রুগীর আত্মীয়-স্বজনকে তিনি কোনদিন টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করেননি। সময় সময় এমনও হয়েছে যে, রুগীর আর্থিক অবস্থা দেখে তিনি ফী তো নেনই নি ; উপরন্তু নিজের পকেট থেকে ঔষধ ও পথ্য কিনে দিয়েছেন তাদের।

রুগীদের এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করবার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বিধান রায়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে রুগীও আসতে থাকে চেম্বারে।

এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে একদিন। কলকাতার জনৈক ধনী ব্যক্তি ডাঃ রায়ের কাছে এসে তাঁকে তাঁর বাড়ীর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান নিযুক্ত করতে চান।

ডাঃ রায় তাঁকে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করলে ভদ্রলোক অম্লান বদনে উত্তর দেন যে, তিনি তাঁকে বার্ষিক ১৫০৲ টাকা হিসাবে দিতে রাজী আছেন।

টাকার পরিমাণ শুনে ডাঃ রায় হেসে উঠে বলেন যে, মাসে ১২৲ টাকা দিয়ে অন্য কোন লোক পাওয়া গেলেও ডাক্তার পাওয়া যায় না।

বিধানচন্দ্রের এই কথায় সেই ধনী ভদ্রলোক নিজেকে

অপমানিত মনে করে শাসিয়ে যান যে, ডাঃ রায় কি করে কলকাতায় প্র্যাক্টিস করেন তা তিনি দেখে নেবেন।

ভগবানের এমনই লীলা যে, কয়েক মাস না যেতেই সেই ভদ্রলোকের বাড়ীর একটি মেয়ে আফিং খায়। অন্যান্য ডাক্তার যাঁদের তিনি কল দিয়েছিলেন, তাঁরা কিছুই করতে না পারায় ভদ্রলোক বাধ্য হন ডাঃ রায়কে কল দিতে।

ডাঃ রায় মেয়েটির 'স্টমাক্ ওয়াস্' করে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলবার পর সেই ভদ্রলোক তাঁর ফী-এর কথা জিজ্ঞাসা করেন।

ডাঃ রায় বলেন যে, তাঁকে ১৫০৲ টাকা দিতে হবে।

ভদ্রলোক তখন বিনাবাক্যব্যয়ে বাক্স থেকে ১৫০৲ টাকা বের করে ডাঃ রায়ের হাতে দেন।

ডাঃ রায় তখন হাসতে হাসতে তাঁকে বলেন—দেখলেন তো। বিধান রায়কে ডাকতে হলে একবারেই তাঁকে ১৫০৲ টাকা দিতে হয়। যাই হোক, এর পর আপনি আর বার্ষিক ১৫০৲ টাকায় ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান যোগাড় করতে চেষ্টা করবেন না।

বিধানচন্দ্রের কথায় ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। এরপর তিনি ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে বার্ষিক ৬০০৲ টাকা হিসাবে দেবেন।

এই সম্পর্কে আর একটি কৌতূহলপ্রদ ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

এক ধনী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ডাঃ রায়কে কল দেন।

রুগী দেখবার পর সেই ভদ্রলোক ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলাপ করবার সময় কথায় কথায় বলেন যে, তাঁকে কল দেবার পিছনে ছোটখাট একটি নির্বাচনের ব্যাপার আছে।

ব্যাপারটা জানবার জন্য ডাঃ রায় আগ্রহ প্রকাশ করায় ভদ্রলোক বলেন যে, তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য অনেক নামকরা ডাক্তার তিনি ডেকেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই এসে কনসাল্টেসনের নামে তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের কল দিতে বলেন। তাঁর তখন মনে হয় যে, ঐ ডাক্তাররা রুগীর চিকিৎসার চাইতে বন্ধু-বান্ধবকে কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়াটাই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেন। তাঁর আরও মনে হয় যে, ঐ সব ডাক্তারদের কাছ থেকে সত্যিকারের ভাল ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই কথা মনে হতেই তিনি তাঁর একজন কর্মচারীকে মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেন। কর্মচারীটিকে ভদ্রলোক বলে দেন যে, তিনি যেন সকাল দশটায় মেডিক্যাল কলেজের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং ছাত্রেরা কলেজ যাবার সময় তাদের কাছে সব চেয়ে ভাল ডাক্তারের নাম জিজ্ঞাসা করেন। এ রকম নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রেরা নিশ্চয়ই স্বার্থের আশায় কথা বলবে না।

এরপর সেই কর্মচারী যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে জানতে পারেন যে, শতকরা ৮৫ জন ছাত্রই ডাঃ রায়ের নাম করেছে।

ভদ্রলোকটি তখন ডাঃ রায়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারেন যে, তিনি এম. ডি. এম. আর. সি. পি. ও এফ. আর. সি. এস. উপাধি লাভ করেছেন।

তাঁর তখন সন্দেহ হয় যে, এই সব উপাধি ভুয়া হওয়াও সম্ভব। এই কথা মনে হতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার আনিয়ে উপাধিগুলো সত্যি কিনা তা যাচাই করে নেন। এইভাবে সব দিক থেকে খোঁজ-খবর নিয়েই ডাঃ রায়কে তিনি কল দিয়েছেন।

ডাক্তার নির্বাচনের এই অভূতপূর্ব পন্থার কথা শুনে ডাঃ রায় অবাক হয়ে যান। মনে মনে প্রশংসাও করেন তিনি সেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উদ্ভাবককে।

ভদ্রলোকের নির্বাচনে যে ভুল হয়নি, অচিরেই তার প্রমাণ তিনি পান। ডাঃ রায়ের চিকিৎসায় তাঁর স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধি কিছুদিনের মধ্যেই আরোগ্য হয়।

এই রকম আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী জড়িত আছে ডাঃ রায়ের চিকিৎসা কার্যের সঙ্গে।

ডাক্তারিতে তিনি যে অতো তাড়াতাড়ি নাম করেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক রুগীকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে আগে তার রোগ ঠিক করে পরে প্রয়োজনীয় চিকিৎসায় তিনি হাত দিতেন। রোগ ঠিক না করে আন্দাজে ঔষধ দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। এতে তাঁর হাতে যে রুগী আসতো সে-ই অল্প দিনের মধ্যেই আরাম হয়ে যেতো।

অনেক সময় দেখা যায় যে, রুগী বড় লোক হলে ডাক্তার তাকে যতদিন সম্ভব ভুগিয়ে টাকা রোজগার করবার পথ প্রশস্ত করেন। তাছাড়া কারণে অকারণে বিরাট বিরাট প্রেসক্রিপসন করে শত শত টাকার ঔষধ কিনতে বাধ্য করেন।

এর কারণ হ'ল, প্রেসক্রিপসনের ওপরে ডাক্তাররা একটা কমিশন পেয়ে থাকেন; আর সেই কমিশনের লোভেই তাঁরা কারণে অকারণে লম্বা লম্বা প্রেসক্রিপসন করে থাকেন।

বিধান রায় কখনও এসব করতেন না। রুগীর রোগ ঠিক করে ঠিক যে ঔষধটা দরকার সেই ঔষধটাই তিনি ব্যবস্থাপত্রে লিখতেন।

ঠিক কি রোগ হয়েছে, তা' নির্ণয় করাই বিধানচন্দ্রের চিকিৎসার বিশেষত্ব। প্রথম থেকেই অতি দ্রুত রোগ নির্ণয় করতে পারতেন তিনি।

কিন্তু সব রোগ স্টেথস্কোপে ধরা পড়ে না। অনেক সময় রক্ত, মল, মূত্র, থুথু ইত্যাদি পরীক্ষা করা দরকার হয়ে পড়ে।

তখনকার দিনে রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করবার মতো ল্যাবরেটরীর খুবই অভাব ছিল। যে দু'একটা ছিল, সেখানে রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করতে দিলে অত্যন্ত দেরী হ'তো। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে ডাঃ রায় তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে নিজের একটা ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন।

এই ল্যাবরেটরী স্থাপনের ফলে রোগ পরীক্ষা ব্যাপারে তাঁর খুবই সুবিধা হয়।

সেই সময় কলকাতার নামকরা যে সব ডাক্তার ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ সর্বাধিকারীর নামই ছিল সব চেয়ে বেশী। তাঁরা দু'জনেই বিধান রায়কে ভালবাসতেন এবং সুযোগ পেলেই তাঁকে কল দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

এইভাবেই অতি অল্প দিনের মধ্যে বিধান রায়ের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতা

প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলেও বিধান রায় সরকারী চাকরি তখনও ছাড়েন নি, এ কথা আগেই বলেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে তাঁর আশা হয়েছিল যে, গভর্নমেণ্ট হয়তো তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার-পদে নিযুক্ত করবেন; কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁকে পুলিস কন্স্টেবলদের প্রাথমিক চিকিৎসা শিখাবার কাজে নিযুক্ত করায় তিনি মনে মনে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।

ডাঃ রায় একদিন সার্জন-জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসারী দিতে অনুরোধ করলেন। সার্জন-জেনারেল বললেন যে, ও কাজ তাঁকে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তিনি আই. এম. এস. নন।

ডাঃ রায় বললেন যে, আই. এম. এস. না হলেও যে কোন আই. এম. এস. ডাক্তারের থেকে শিক্ষকতার যোগ্যতা তাঁর অনেক বেশী। এমন কি এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় তাঁর অনেক নীচে যে সব ডাক্তারের স্থান ছিল, তাঁরাও

যখন মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার হতে পেরেছেন, তখন তিনিই বা সে পদ পাবেন না কেন ?

এর উত্তরে সার্জন-জেনারেল বলেন যে, প্রভিনসিয়েল সার্ভিসের ডাক্তার বলেই তাঁকে ঐ পদে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। ডাঃ রায় যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষকের পদ পেতে পারেন।

মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার আর ক্যাম্বেল স্কুলের শিক্ষক—সম্মানের দিক দিয়ে এই দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত। তবুও তিনি যখন দেখলেন যে, প্রফেসারী পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, তখন কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ক্যাম্বেল স্কুলে শিক্ষকতা করতে রাজী হলেন।

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে চাকরি করবার সময়ও ডাঃ রায়ের সঙ্গে ওখানকার ইংরেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের একাধিক বার কথা কাটাকাটি হয়। দোষ অবশ্য প্রত্যেকবারই সাহেবদেরই ছিল।

দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

মেজর রেইট নামে এক আই. এম. এস. অফিসার তখন ঐ স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

একদিন কথায় কথায় মেজর সাহেব ডাঃ রায়কে বলেন যে, তিনি খুব বেশী টাকা মাইনে পাচ্ছেন স্কুল থেকে।

এই কথায় ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন যে, কথাটা ঠিকই বলেছেন তিনি। তবে একটা কথা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না যে, একজন এম. আর. সি. পি. এফ. আর. সি. এস. ও এম. ডি. ডাক্তার যেখানে মাত্র ৩৩০৲ টাকা মাইনে পান সেখানে এডিনবরা ফেলোশিপ পরীক্ষায় ফেল করা একজন ডাক্তার কি করে ১৫০০৲ টাকা মাইনে পাচ্ছেন!

ডাঃ রায়ের কথা শুনে মেজর সাহেবের চোখ মুখ অপমানে লাল হয়ে ওঠে, কারণ ডাঃ রায় এ কথা তাঁকেই উদ্দেশ করে বলেছিলেন।

তিনি ধারণাও করতে পারেন নি যে, একজন বাঙালী ডাক্তার তাঁর মুখের ওপর ঐ ভাবে তাঁকে অপমান করতে পারেন। তিনি তখন সে অপমান মুখ বুজে হজম করে নিয়ে ডাঃ রায়কে জব্দ করবার চেষ্টায় থাকেন। কিন্তু যতবারই তিনি ডাঃ রায়কে জব্দ করতে চেষ্টা করেছেন, ততবারই তিনি নিজে তাঁর কাছে জব্দ হয়েছেন।

এই মেজর সাহেব যখন ক্যাম্বেল স্কুল থেকে বদলি হয়ে যান সেই সময় তিনি বিধানচন্দ্রকে বলেছিলেন

—ডাঃ রায়, আপনি বোধ হয় মনে করেন যে আমি একটা গাধা ?

এই কথায় ডাঃ রায় বলেন—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একটু কঠিন। কারণ আমি যদি 'হ্যাঁ' বলি তাহলে আপনি মনে দুঃখ পাবেন। আবার যদি 'না' বলি তাহলে নিজের বিবেকের কাছেই আমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হব। সেই জন্যই বলছি যে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।

বিধানচন্দ্রের এই কথায় মেজর রেইট বলেন যে, তাঁর জন্যেই তিনি ক্যাম্বেল স্কুল থেকে চলে যাচ্ছেন, কারণ তিনি তাঁর সামনে নিজেকে ছোট বলে মনে করেন।

আর একটি ঘটনা।

এটি ঘটেছিল তিনি ক্যাম্বেলে আসবার কয়েকদিন পরেই। ক্যাম্বেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন কর্নেল এণ্ডার্সন নামে এক আই. এম. এস. অফিসার। এই ভদ্রলোক ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ডাঃ রায়ের বিভাগের জন্য একজন সহকারী ডেমন্‌স্ট্রেটর নিযুক্ত করেন।

ডাঃ রায় এতে নিজেকে অপমানিত বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং শেষ পর্যন্ত কর্নেল এণ্ডার্সনকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে ছাড়েন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিধানচন্দ্র ক্যাম্বেল স্কুলে ছিলেন। এরপর তিনি হঠাৎ একদিন পদত্যাগ করে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের (বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) মেডিসিনের প্রফেসার হয়ে চলে যান।

কারমাইকেল কলেজে তাঁর যোগদানের একটা চমৎকার ইতিহাস আছে।

একদিন তিনি যখন গাড়ী করে বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের গাড়ী তাঁর উল্টো দিক দিয়ে এসে পড়ে। বিধান রায়ের গাড়ী দেখে ডাঃ মিত্র তাঁকে থামতে অনুরোধ করেন।

গাড়ী থামলে ডাঃ মিত্র তাঁর কাছে এসে বলেন যে, আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের এফিলিয়েশনের প্রশ্নে সিণ্ডিকেটের অভিমত জানা যাবে।

তিনি আরও বলেন যে, সিণ্ডিকেটের মত এই যে, বিধান রায়কে মেডিসিনের প্রফেসার করে নিতে পারলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই এফিলিয়েশন দেবেন। ডাঃ মিত্রের কাছে এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ রায় বলেন যে, তিনি সেই দিনই কারমাইকেল কলেজে যোগদান করতে রাজী আছেন।

ডাঃ মিত্র খুবই খুশী হলেন এ কথা শুনে। তিনি

তখুনি গিয়ে সিণ্ডিকেটকে জানিয়ে দিলেন যে, ডাঃ রায় কারমাইকেল কলেজে যোগ দিয়েছেন। ফলে সেইদিনই কারমাইকেল কলেজ সিণ্ডিকেটের অনুমোদন লাভ করলো।

এদিকে ডাঃ রায়ও সেইদিনই ক্যাম্বেল স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কারমাইকেল কলেজে চলে এলেন। সেইদিন থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ডাঃ রায় কারমাইকেল কলেজের প্রফেসার ছিলেন।

ডাঃ রায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে যোগদানের কিছুকাল আগে তাঁর পিতৃসম শুভানুধ্যায়ী ও গুরু কর্নেল লুকিস পরলোক গমন করেন। কর্নেল লুকিসের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তিনি শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করবার কিছুদিন পরেই স্যর আশুতোষের অনুরোধে ডাঃ রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের ফেলো পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীরূপে দাঁড়ান। সেই সময় প্রত্যেক ফেলোই সিনেটে তাঁর পদকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য অন্ততঃ একশ' নূতন গ্রাজুয়েটের ভোট কিনে নিতেন।

ডাঃ রায় এই ব্যবস্থায় রাজী না হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করেই নির্বাচনপ্রার্থী হ'ন। ভোট নেওয়া হয়ে গেলে দেখা যায় যে, তিনি বহু ভোটাধিক্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তিনজন প্রার্থীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন। এই তিনজন প্রার্থীর নাম (১) চারুচন্দ্র বিশ্বাস, (২) মন্মথনাথ রায় ও (৩) ডাঃ কেদার দাশ।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেলো নিযুক্ত হবার পর থেকেই বিধান রায় বিশ্ববিদ্যালয়কে কি করে আরও উন্নত করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার তখন স্যর আশুতোষ। ডাঃ রায়ের

কর্তব্যপরায়ণতা ও বহু বিষয়ে দূরদর্শিতা দেখে গুণগ্রাহী আশুতোষ অচিরেই তাঁকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিলেন।

এই সময় স্যর জি. সি. মিত্র আইনসভায় বক্তৃতা করবার সময় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এমন কতকগুলো উক্তি করেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান অনেকখানি ব্যাহত হয়। বিধানচন্দ্র স্যর জি. সি. মিত্রের ঐ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে সিনেটে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিত্র মহাশয়ের ঐ মন্তব্যে আশুতোষও অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন; তাই ডাঃ রায়ের প্রস্তাবটি সর্ববাদিসম্মতিক্রমে পাস হয়ে যায়।

এরপর সিনেটের সভ্যদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করে দেখতে পান যে, দোষ যা কিছু সবই গভর্নমেণ্টের। গভর্নমেণ্টের বিমাতা-সুলভ মনোভাবের জন্যই স্যর জি. সি. মিত্র ঐ রকম মন্তব্য করেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন, আসলে তার কোন ভিত্তি নেই।

এর কিছুদিন পরে আশুতোষের ভাইস-চ্যান্সেলারির সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সেই সময় বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন তাঁকে একখানা চিঠি লিখে জানান যে, তিনি যদি সেই

সাহেবের দেওয়া কয়েকটা শর্ত মেনে চলতে রাজী হ'ন, তাহলে তাঁকে আবার ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হবে।

লর্ড লিটনের এই চিঠিখানা স্যর আশুতোষ ডাঃ রায়কে দেখিয়ে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে গভর্নরের এভাবে হস্তক্ষেপ করবার প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া দরকার। ডাঃ রায়ও তাঁর সঙ্গে একমত হন।

এর পরেই সিনেটের সভায় আশুতোষ তাঁর সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন—যাতে তিনি বলেছিলেন—"Freedom first ; Freedom second and Freedom always."

এর কিছুদিন পরেই আইনসভার নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসে। স্যর আশুতোষ ডাঃ রায়কে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলেন। কথা হয় যে, তিনি ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে স্যর স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এককালে স্থরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার মুকুটহীন রাজা। সে সময় তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়াবার সাহস বোধ হয় কারোই হ'তো না। কিন্তু যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন স্থরেন্দ্রনাথের সে জনপ্রিয়তা আর নেই। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার পর থেকেই তিনি সে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন।

যাই হোক, তবুও তিনিই তখন বাংলায় অবিসংবাদী জননেতা। এই রকম একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ানো বড় কম সাহসের পরিচয় নয়। বিধান রায় কিন্তু সেই সাহসেরই পরিচয় দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ালেন তিনি।

সেদিনের সেই নির্বাচনের কথা বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বহু ভোটের ব্যবধানে বিধানচন্দ্রের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

সেই প্রথম বিধানচন্দ্র প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, বিধানচন্দ্র রাজনীতিতে এলেন কেন? এ প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর একটি লেখায়।

"অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত সরকার যখন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন সে পদ আমি গ্রহণ করিনি কেন?

কেনই বা আবার বাংলাদেশের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে গেলাম? কি প্রয়োজন ছিল আমার তা?

আমি চিকিৎসক, চিকিৎসা করেই আমার জীবনকে কাটিয়ে দিতে পারতাম। তা কাটালাম না কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে, ফিরে যেতে হবে আমার শৈশবের একটি ঘটনায় যা সেদিন আমার শিশুমনকেও দোলা দিয়ে গিয়েছে।

আমাদের বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের আসা-যাওয়া লেগেই থাকতো। তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ির অতিথি হতেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ শ্যামাকান্ত। পরবর্তী জীবনে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানের চিন্তায় তিনি হিমালয়ের কন্দরে জীবনের শেষের দিনগুলো কাটিয়ে গিয়েছেন। যাক্, সে কথা আমার বক্তব্য বিষয় নয়।

যে কথা বলছিলাম। আমি শুনতাম তিনি নাকি বাঘের ঘরে প্রবেশ করে নিজের ইচ্ছামত বাঘকে খেলাতে পারেন। বিস্ময়ে ভরে যেত আমার মন।

দু-একবার তাঁর খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রায়ই আমার মনে এই প্রশ্ন জাগতো কেমন করে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেন ?

একদিন জিজ্ঞাসাই করলাম তাঁকে—"আপনার ভয়

করে না ? বাঘ যদি আক্রমণ করে আপনাকে, তা হলে আপনি কি করে আত্মরক্ষা করবেন ?”

উত্তরে শ্যামাকান্তবাবু বললেন—“দেখ, আমি যখন বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকি, তখন আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঘকে বোঝাতে চেষ্টা করি আমিই তার প্রভু। শক্তিতে সে আমার কাছে কিছুই নয়। তাই সে আমার কাছে পোষ মানে। আমার ইচ্ছামত খেলা দেখাতে সে তখন ভয়ে বাধ্য হয়।

“কিন্তু আমি যে মুহূর্তে বুঝতে পারি, এবারে বাঘ তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আমি তার খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসি। নইলে সে আমাকে দাঁত আর নখের সাহায্যে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

“ঠিক তেমনি আমাদের দেশের এই ইংরেজ প্রভুরা। তারা সদাসর্বদা আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করে, আমরা ঘৃণ্য, আমরা পদদলিত। ইংরেজের বুটের তলায় থাকতেই আমাদের জন্ম। স্বাধীনতালাভের কোন অধিকার বুঝি আমাদের নেই। বন্দী বাঘের মতই ভারতবাসী আজ সেই কথাই বিশ্বাস করে।

“কিন্তু যেদিন ভারতবাসী তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবে, বুঝতে পারবে তার শক্তির কথা, সেই দিন কুকুরের

মত লেজ গুটিয়ে ইংরেজ জাতিও ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। আমার বিশ্বাস সে দিনের আর দেরি নেই”—কথা বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

তাঁর সামান্য ক-একটা কথাই আমার শিশুমনেও করলো রেখাপাত।

আমরা ভারতবাসী, আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলেই আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল খুলে পড়তে বাধ্য।

এই কথায় বিশ্বাস করে সেই ভুলে-যাওয়া শক্তিকে জাগাবার জন্যই যৌবনে আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম দেশবন্ধুর। ভালবাসলাম নিজের দেশকে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দেশের কাজে উৎসর্গ করলাম নিজেকে। তখন থেকে আমার একমাত্র ব্রত হল আমার দেশের সেবা করা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রিত করাই হল আমার একমাত্র লক্ষ্য।

১৯৪৭ সালে ইংরেজ ভারতবর্ষ ছাড়তে বাধ্য হল। কারণ তারা তখন প্রত্যক্ষভাবে বুঝেছিল, ভারত ছাড়ার এই-ই প্রকৃত সময়। নইলে, ভবিষ্যতে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে তারা ভারতবর্ষ ছাড়তে বাধ্য হবে।

তখন থেকেই আমি সুযোগ পেলাম আমার দেশের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে।

আমার কর্মক্ষেত্র আমি বেছে নিলাম আমার এই বাংলাদেশকে। আমি বিশ্বাস করি বাঙালী জাতির একটা গৌরবময় ইতিহাস আছে। কারণ এই দেশেতেই জন্মেছেন ভগবান শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। এই দেশেরই কবি রচনা করেছেন মাতৃমন্ত্র। এই দেশেরই ছেলে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন বিশ্ববরেণ্য।

এত গৌরবময় যার ইতিহাস সে জাতি কি কখনও সামান্য হতে পারে?

আমি বিশ্বাস করি বাঙালী জাতি নিজের বুদ্ধিমত্তা আর শক্তি সম্বন্ধে যখনই আবার পরিপূর্ণভাবে সচেতন হবে, তখনই সে 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

সে সুদিন দেখবার জন্য হয়তো আমি আর এ পৃথিবীতে থাকবো না কিন্তু থাকবে আমার আশীর্বাদ।

আমি মনেপ্রাণে একথাও বিশ্বাস করি, সে দিনের আর দেরি নেই।"*

নির্বাচিত হবার পর ডাঃ রায় দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। কাগজে-কলমে

*["নবকল্লোল" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭) থেকে উদ্ধৃত]

স্বরাজ্য দলে যোগদান না করলেও পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে তিনি দেশবন্ধুর পরামর্শ মতোই চলতেন।

কাউন্সিলে বিধানচন্দ্র যে সব বক্তৃতা দিতেন সেগুলি এমনই হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যপূর্ণ হ'তো যে, সরকার পক্ষও সেগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। বক্তৃতার সময় তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যেতো।

এমনকি, বাজেটের মতো নীরস তথ্যবহুল বিষয়েও বিধানচন্দ্র যে সব বক্তৃতা করতেন, তাতে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ সবাই চমৎকৃত হয়ে যেতেন।

কাউন্সিলে বিধানচন্দ্রের সবচেয়ে যুগান্তকারী রাজনৈতিক বক্তৃতা হ'ল প্রেসিডেণ্টকে অপসারণের প্রস্তাবের পক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা। ঐ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট কুমার শিব শেখরেশ্বর রায়কে অপসারণের জন্যই ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বিধানচন্দ্র সেই বক্তৃতায় গ্রেহামের 'মাদার অব পার্লামেণ্ট' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যেভাবে অনর্গল বক্তৃতা করে যান, তা থেকেই পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে তাঁর অধিকার সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রেসিডেণ্টের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে বিধানচন্দ্র

বলেছিলেন—"I say it is you who have lowered the dignity of the House."

পার্লামেণ্টারী ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের বিষয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে ডাঃ রায় ওজস্বিনী ভাষায় সরকারের স্বেচ্ছাচারের কথা উল্লেখ করে বলেন—"In India when prestige enters by the front door, dignity escapes by the back door."

বক্তৃতা শেষ করবার আগে তিনি বলেছিলেন—

"If this motion is lost, the result will be due to the Government being able to command a subservient and slavish majority. In that case I shall be able to throw open the doors of the House and show to the people the figure of the elected president of the Council as a henchman tied to the Treasury Bench and clothed in a robe of prestige by a benign Government."

সেই আমলে—যখন ইংরেজের প্রতাপে সারা দেশ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো—বিধানচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন, তা

থেকেই তাঁর সাহস ও গভীর রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর থেকেই তিনি স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রধান বক্তারূপে দেখা দেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিধানচন্দ্রের বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির আর একটি নমুনা এখানে উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ করে বক্তৃতা দেওয়া যেন সরকারী পক্ষের সদস্যদের একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

বাংলার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্স্ট্রাকশন মিঃ ওটেন (ইনি সেই মিঃ ওটেন যিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ থাকা কালে ভারতবাসীদের সম্পর্কে অশিষ্ট উক্তি করেছিলেন এবং যার ফলে সুভাষচন্দ্র তাঁর জামার কলার ধরে অধ্যাপকের আসন থেকে টেনে নামিয়েছিলেন) কাউন্সিলে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

মিঃ ওটেনের এই অশিষ্ট মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে বিধানচন্দ্র তাঁর বক্তৃতার সময় তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেন—আপনারা

সিনেটে বেশী করে মুসলমান সদস্য মনোনীত করেন না কেন ?

বিধানচন্দ্রের এই প্রশ্নে মিঃ ওটেন একেবারে নির্বাক হয়ে যান। নির্বাক হবার কারণ এই যে, সে সময় সিনেটের সদস্যদের বেশির ভাগই সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। মুসলমানদের মধ্যে সিনেটের সদস্য হবার উপযুক্ত লোকের অভাব ছিল বলেই সরকার পক্ষ বাধ্য হয়ে হিন্দু শিক্ষা-ব্রতীদের মনোনীত করতেন।

শোনা যায়, এরপর মিঃ ওটেন আর এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনরকম উচ্চবাচ্য করেন নি।

প্রতিপদে সরকার পক্ষকে এইভাবে নাজেহাল করবার ক্ষমতা তখন খুব কম সদস্যেরই ছিল। তাই দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যখন দলের লীডার নির্বাচিত হ'ন, তখন বিধানচন্দ্রকে করা হয় ডেপুটী লীডার।

কলিকাতা কংগ্রেস

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পার্কসার্কাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস শিবির পর্যন্ত সভাপতিকে নিয়ে যাবার যে রাজকীয় ব্যবস্থা হয়েছিল, সে কথা কলিকাতাবাসীর মধ্যে আজও অনেকের মনে আছে। ৩৬ ঘোড়ার গাড়ীতে করে নির্বাচিত সভাপতিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর আগে ও পিছে বিরাট একদল স্বেচ্ছাসৈনিক মার্চ করতে করতে যায়।

খদ্দরের খাকী পোশাকপরা সেই সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসৈনিকদের সামরিক কায়দায় একযোগে যাওয়া সেদিন কলকাতাবাসীর মনে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল।

স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে জি. ও. সি.-রূপে (General Officer Commanding) ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। অশ্বপৃষ্ঠে অফিসারের পোশাকপরা নেতাজীকে দেখে সেদিন মনে হয়েছিল যেন ভারতের প্রধান সেনাপতি।

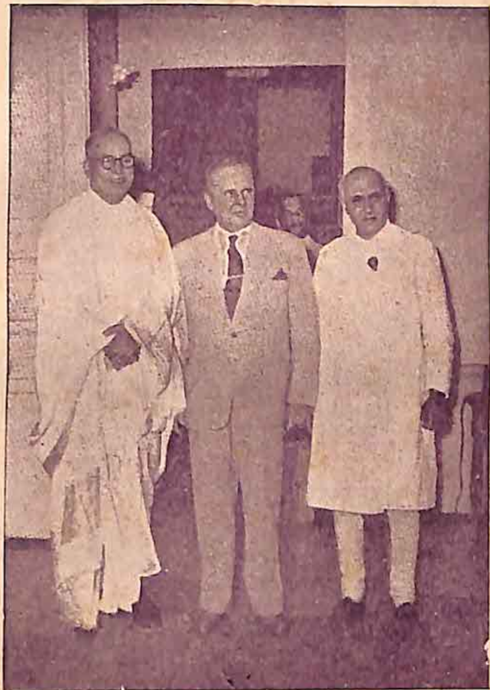
কংগ্রেস মণ্ডপের সজ্জা এবং প্রদর্শনী বিভাগের ভার নিয়েছিলেন স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকার। আজ যেখানে 'কংগ্রেস এক্‌জিবিশন রোড', সেখানে তখন ছিল এক বিরাট মাঠ। সেই মাঠেই বসেছিল প্রদর্শনী। অতি অল্পদিনের মধ্যে সেই বিরাট প্রদর্শনীর যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা' কল্পনাতীত।

বিধান রায় ছিলেন জেনারেল-সেক্রেটারী ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

এঁদের চার জনের (নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং ডাঃ বিধান রায়) সমবেত প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সব দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

সে সময় বাংলার কংগ্রেস কমিটি দলাদলিতে বিচ্ছিন্ন-প্রায় ছিল। বিধান রায় নিজেকে ঐ সব দলাদলির বাইরে রেখে অক্লান্তভাবে কাজ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সেই দলনিরপেক্ষ মনোভাবের জন্যেই অনেক কিছু মতানৈক্যের সমাধান সম্ভব হয়েছিল।

এ. আই. সি. সি.-তে বাংলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এক গোলমালের সৃষ্টি হয়। ওয়ার্কিং কমিটির



ডাঃ রায়, মার্শাল টিটো ও পণ্ডিত নেহেরু

পরামর্শে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বাংলা থেকে এ. আই. সি. সি.-র যে সভ্যসংখ্যা স্থির করে দেন, তাতে অনেকেই খুশি হননি। এই কারণেই ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে এ. আই. সি. সি.-র সভায় সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেণ্টের রুলিং-কে চ্যালেঞ্জ করে এক মুলতবী প্রস্তাব (adjournment motion) উত্থাপন করেন।

এই ব্যাপারে এক গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বেশ কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। অবস্থা দেখে সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র এক আপীল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পণ্ডিত মতিলাল তখন সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবকে বাতিল করে দেন এবং পরদিন আপীল প্রস্তাব নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হবে বলে রুলিং দেন।

প্রেসিডেণ্টের সেই রুলিংয়ে বাংলার প্রতিনিধিদের শিবিরে হতাশার সঞ্চার হয় এবং সেখানকার বেশির ভাগ সদস্য সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে বের হয়ে আসেন।

কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষমণ্ডলের দুই দলের সেই মতানৈক্য দূর করতে বিধানচন্দ্র তাঁর সর্ব শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি মধ্যস্থ হয়ে দুই দলের সেই বিপদ মিটিয়ে

ফেলতে সচেষ্ট হন এবং দুই পক্ষের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করে শেষ পর্যন্ত বিবাদ মিটাতে সক্ষম হ'ন।

কংগ্রেসের সভ্য না হয়েও ডাঃ রায় যেভাবে কংগ্রেসের দলাদলি মিটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে জন্য প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীই তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

কলিকাতার মেয়র

ঐতিহাসিক ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসর লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস দল কাউন্সিল বর্জন করবেন বলেই স্থির হয়। এই সিদ্ধান্ত অচিরেই কার্যকরী হয়। কংগ্রেস দল কাউন্সিল থেকে একযোগে বেরিয়ে আসেন।

এর পরেই আরম্ভ হয়ে যায় সারা ভারত জুড়ে এক মহা আন্দোলন। ইতিহাসে সে আন্দোলনকে বলা হয়—"লবণ সত্যাগ্রহ"। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশ জেগে ওঠে—ইংরেজের আইন তারা মানবে না। নিজেদের দরকারী লবণ তারা জোর করে তৈরি করবে।

বলা বাহুল্য, লবণ তৈরীর একচেটিয়া অধিকার তখন গভর্নমেণ্টের হাতে ছিল।

দেশবাসীর এই অভ্যুত্থানে সরকারী কর্তৃপক্ষ ভাবিত হয়ে ওঠেন। দলে দলে নেতাদের ধরে নিয়ে তাঁরা জেলে বন্ধ করতে আরম্ভ করেন।

বাংলা থেকে সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন এবং আরও বহু জননেতা কারারুদ্ধ হন।

যতীন্দ্রমোহন সেই সময় কলিকাতার মেয়র ছিলেন। এদিকে মেয়র এবং অল্ডারম্যানদের কারাবরণে কর্পোরেশনের কাজচালানো কংগ্রেসের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তখন বিধানচন্দ্রকে অনুরোধ করেন অল্ডারম্যান হতে।

১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবক্রমে কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন।

এর পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মেয়র নির্বাচনের সময়ও বিধানচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হয়। তাঁর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীসন্তোষ কুমার বসু। কিন্তু এবারে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারেন না। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ান শ্রী জে. এন. মৈত্র ও মৌলভী ফজলুল হক। নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হলে দেখা যায় যে, ডাঃ রায় বহু ভোটাধিক্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জনকে পরাজিত করেছেন। সেই নির্বাচনে তিনি পান ৪২ ভোট, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জে. এন. মৈত্র পান ২৬ ভোট ও ফজলুল হক সাহেব পান মাত্র ৮ ভোট।

দ্বিতীয় বার মেয়র নির্বাচিত হবার ছয় মাস পরেই

তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপে কারারুদ্ধ হ'ন।

বিধানচন্দ্র মেয়র থাকাকালে কলিকাতা কর্পোরেশন তথা কলিকাতা শহরের উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। কর্পোরেশনের কাজে তিনি যত সময় ব্যয় করতেন, তাঁর আগে আর কোন মেয়র তত সময় ব্যয় করেন নি। তাই দ্বিতীয়বার মেয়র পদ থেকে তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন কাউন্সিলার শচীন্দ্রনাথ মুখার্জী এই বলে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন যে, তিনিই প্রথম মেয়র, যিনি সকাল থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত মেয়রের অফিসে বসে কাজ করেছেন।

বিধানচন্দ্র মেয়র থাকাকালে স্যর চার্লস্ টেগার্ট (কলিকাতার ভূতপূর্ব পুলিস কমিশনার) বিলাতে এক বিবৃতিতে বলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন সন্ত্রাসবাদী যুবকদের একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর হাতে এমন সব প্রমাণ আছে যার দ্বারা তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে, কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ জ্ঞাতসারে ঐ সব সন্ত্রাসবাদী যুবকদের চাকরি দিয়ে সহায়তা করেছেন।

স্যর টেগার্টের এই বিবৃতির পূর্ণ বিবরণী ছেপে

কলিকাতার ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েসন বিলি করতে আরম্ভ করেন।

সেই বিবৃতির এক নকল কর্পোরেশনের সভায় উপস্থিত করা হলে মেয়র বিধান রায় সিংহের মতো গর্জন করে উঠে বলেন যে, ঐ অভিযোগ দুরভিসন্ধিমূলক, ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা।

এক দীর্ঘ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক কোন সন্ত্রাসবাদী যুবককে কর্পোরেশনে চাকরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যুবকটির যদি ঐ চাকরির পূর্ণ যোগ্যতা থাকে এবং সে যদি সন্ত্রাসবাদের সহিত তার সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দিয়ে থাকে, তা'হলে তাকে চাকরি দেওয়া কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের পক্ষে কেন অন্যায় হবে, তা' তিনি বুঝে উঠতে পারেন না! ডাঃ রায় দৃঢ়স্বরে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্যর চার্লস টেগার্টের বিবৃতি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে নিছক রাজনৈতিক প্রচারকার্য মাত্র।

বিধানচন্দ্রের এই অগ্নিবর্ষী বক্তৃতার পরে কর্পোরেশনের ইয়োরোপীয়ান কাউন্সিলার ও কলিকাতার ইয়োরোপীয়ান সমাজ একেবারেই চুপ করে গিয়েছিলেন।

সিম্পসন হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক দীনেশ গুপ্তের

ফাঁসীর ব্যাপারে কর্পোরেশন কর্তৃক যে শোকপ্রস্তাব পাস করা হয়েছিল, সে সময়ও বিধানচন্দ্র এমনি সাহসেরই পরিচয় দিয়েছিলেন।

কর্পোরেশনের সঙ্গে গভর্নমেণ্টের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেয়র বিধানচন্দ্র একদিন বলেছিলেন যে, এমন একদিন আসবে যখন গভর্নমেণ্ট কর্পোরেশনকে শত্রুরূপে দেখবে না—এবং কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও বিধান সভার সভ্যরা সবাই মনে করবেন যে, তাঁরা নিজের দেশের এবং নিজের লোকদের জন্যই কাজ করছেন। হয়তো ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যে, গভর্নমেণ্টের উচ্চতম আসনে কোন এক ভারত-সন্তানকে দেখতে পাওয়া যাবে—যাঁর ক্ষমতার ওপরে প্রশ্ন করবার অধিকার কোন বিদেশীরই থাকবে না।

কুড়ি বৎসর পরে দেখতে পাওয়া গেছে ডাঃ রায়ের সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তখন ভারত গভর্নমেণ্টের সর্বোচ্চ আসনে ভারত-সন্তান ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আর পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের কর্ণধার সেদিনের সেই মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র।

কারাবাস

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা প্রস্তাব পাস হবার পরেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়, একথা আগেই বলেছি।

লাহোর কংগ্রেসেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক বৎসরের ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি স্বাধীনতা দিবসরূপে পালন করতে হবে। ঐ দিন ভারতের প্রত্যেক শহরে ও জনপদে প্রকাশ্য জায়গায় কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করতে হবে।

কলিকাতার কংগ্রেস ভবনের শীর্ষে জাতীয় পতাকা (তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের পতাকা জাতীয় পতাকারূপে স্বীকৃতিলাভ করে নি) উত্তোলনের ভার দেওয়া হ'ল ডাঃ বিধান রায়কে।

মহা উৎসাহ আর উদ্দীপনার ভিতরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন ডাঃ রায়।

এর কিছুদিন পরের কথা।

সারা ভারতে তখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে অনেকেই তখন জেলে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে রাখা হয়েছিল নৈনি জেলে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে একদিন ডাঃ রায়ের কাছে খবর এলো যে, পণ্ডিতজীর কাশির সঙ্গে রক্ত দেখা গেছে।

এই সংবাদ শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ রায় ছুটলেন নৈনি জেলের উদ্দেশে।

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট তখন ডাঃ আন্সারী। বিধান রায়ের সঙ্গে তিনিও গেলেন পণ্ডিতজীকে দেখতে।

জেলখানায় গিয়ে পণ্ডিতজীকে পরীক্ষা করবার পর ডাঃ রায় যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) সরকারের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠালেন। আবেদনপত্রে পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যের অবনতির কথা উল্লেখ করে ডাঃ রায় তাঁকে মুক্তি দিতে অনুরোধ জানালেন।

সরকার থেকে উত্তর এলো যে, পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য তাঁরা সরকারী ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করতে চান।

গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এই উত্তর পেয়ে ডাঃ রায় এলাহাবাদে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে ডাঃ আন্সারীর বাড়ীতে ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহ্বান করা হ'ল।

ডাঃ রায় ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য বলে ডাঃ আন্সারী তাঁকে টেলিফোনে বললেন যে, ঐ সভায় কোন জরুরী বিষয়ের আলোচনা হবে না, সুতরাং তিনি যেন এলাহাবাদ থেকে না আসেন।

দিল্লীতে যেদিন ওয়ার্কিং কমিটির সভা হ'ল, তার পর-দিন সন্ধ্যার সময় ডাঃ রায় খবর পেলেন যে, ওয়ার্কিং কমি-টিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেছে গভর্নমেণ্ট।

তখন এলাহাবাদে বসে থাকা নিরর্থক বিবেচনা করে বিধানচন্দ্র কলিকাতা চলে আসবেন ঠিক করলেন। কথা হ'ল ডাঃ আন্সারী এবং ওয়ার্কিং কমিটির আরও দু'একজন সদস্য তাঁর সঙ্গে কলিকাতায় আসবেন।

কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁদের পূরণ হ'ল না। ডাঃ রায় ও ডাঃ আন্সারীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

এরপর বিচারের এক প্রহসনে তাঁর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে পুলিস হেফাজতে তাঁকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

কলিকাতায় এনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

জেলের ভিতরে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কিরণশঙ্কর রায় ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তখন সেখানে রয়েছেন।

তাঁদের প্রত্যেককেই প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে রাখা হ'ল জেলে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন মেজর পাট্‌নি (Major S. L. Patney, I. M. S.)।

নিজে ডাক্তার বলে ডাঃ রায়কে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ডাঃ রায়কে অনুরোধ করলেন জেল হাসপাতালের ভার নিতে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের হাসপাতালে ২৫০টি বেড। সুতরাং তাকে খুব ছোট বলা চলে না। ডাঃ রায় সানন্দেই সেই হাসপাতালের ভার নিতে রাজী হলেন।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ডাঃ রায়ের ভাগ্যে হ'ল তাই। কয়েদী হিসাবে জেলে এসেও তাঁকে হাসপাতালের ভার নিতে হ'ল।

অবশ্য রুগীদের পক্ষে এটা হ'ল দেবতার আশীর্বাদের মতো। বিধানচন্দ্রের চিকিৎসার গুণে রুগীদের কঠিন রোগও আরোগ্য হয়ে যেতে লাগলো।

জেল হাসপাতালে তখন নূতন আবিষ্কৃত ভাল ভাল ঔষধ পাওয়া যেতো না। ডাঃ রায় নিজে চিঠি লিখে সেই সব ঔষধ আনালেন।

তাঁর চিকিৎসার গুণে হাসপাতালের মৃত্যুর হার সে বৎসর অনেক কম হয়।

মেজর পাট্‌নি গভর্নমেণ্টের কাছে সে কথা জানালে, গভর্নমেণ্ট থেকে বিধানচন্দ্রের শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হয়।

গান্ধীজীর সঙ্গে

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিধান রায়ের প্রথম দেখা হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের মহারাজার বাড়ীতে। ডাঃ রায় তখন মেডিকেল কলেজের সহকারী হাউস সার্জেন আর মহাত্মা গান্ধী সবে তখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছেন। সেই সময় গান্ধীজীকে দেখে ডাঃ রায়ের মনে হয়েছিল যে, তিনি আর যাই হোন, বক্তা নন।

গান্ধীজীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের দ্বিতীয়বার দেখা হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধুর বাড়ীতে। দেশবন্ধু যখন মারা যান, ডাঃ রায় তখন শিলং-এ। খবরের কাগজে দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পড়েই তিনি স্তব্ধ হয়ে যান! সেই দিনই তিনি কলিকাতা রওনা হ'ন এবং কলিকাতায় পৌঁছেই তিনি ভবানীপুরে দেশবন্ধুর বাড়ীতে ছুটে যান বাসন্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে।

বিধানচন্দ্র বাসন্তী দেবীর ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন যে, মহাত্মা গান্ধী বাসন্তী দেবীর কাছে বসে আছেন।

ডাঃ রায়কে দেখেই বাসন্তী দেবী কেঁদে উঠে বলেন—ডাঃ রায়, আপনি যদি দার্জিলিং-এ থাকতেন, তাহলে বোধ হয় আজ আমার এ অবস্থা হ'ত না!

ডাঃ রায়ের উপরে বাসন্তী দেবীর অতখানি বিশ্বাস দেখে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন।

বিধান রায়ের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সেই হ'ল প্রথম আলাপ।

এরপর বহু ব্যাপারে এবং বহু ঘটনার সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে বহুবার দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয় এবং ক্রমে তাঁদের পরিচয় রীতিমত ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

মহাত্মা গান্ধী ডাঃ রায়কে কতখানি আপনার ভাবে দেখতেন সে সম্বন্ধে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রায় একদিন ট্রেনে রায়পুর যাচ্ছিলেন এক রোগী দেখতে। মহাত্মা গান্ধীও ঐ ট্রেনে যাচ্ছিলেন। ডাঃ রায় সে কথা জানতেন না। মাঝখানে একটা স্টেশনে ডাঃ রায় প্লাটফর্মে নামলে মহাত্মাজী তাঁকে দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডাকেন।

ডাঃ রায় গান্ধীজীর কামরায় গেলে তিনি একটা বড় বাক্স তাঁকে দিয়ে বলেন—এই বাক্সের ভিতরে যে সব

জিনিস আছে সেগুলো বিক্রি করে হিসাব আর টাকা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

বাক্সটার ভিতরে কি ছিল, তার কোন তালিকা গান্ধীজীর কাছে ছিল না।

বিধানচন্দ্র তখন বাক্সটিকে তাঁর কামরায় নিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত সেটাকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

বাড়ীতে এনে বাক্সটা খুলে তিনি দেখতে পান যে, তার ভিতরে প্রায় চার হাজার টাকার জিনিস আছে।

ডাঃ রায় তখন সেগুলো বিক্রি করে হিসাব আর টাকা গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়ে দেন।

এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, গান্ধীজী ডাঃ রায়কে কতখানি বিশ্বাস করতেন।

এরপর গান্ধীজীর সঙ্গে আবার বিধানচন্দ্রের দেখা হয় পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে। তখন গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে।

ডাঃ রায় কথায় কথায় গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির মতের বিরুদ্ধে ওরকম একটা চুক্তিপত্রে তিনি কেন সই করলেন!

এর উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, লর্ড আরউইন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না বলেই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।

বিশ্বাস করবার কারণও তিনি বলেন।

বিকেল পাঁচটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে। আলোচনার শেষদিকে লর্ড আরউইন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলেন—"আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন কেন? আমি খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান কখনও মিথ্যা কথা বলে না।"

গান্ধীজী জানান যে, লর্ড আরউইনের মুখে এই কথা শুনবার পর ওয়ার্কিং কমিটির মতের বিরুদ্ধেও তিনি ঐ চুক্তিপত্রে সই করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের এই রকম অন্তরঙ্গতা তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার কংগ্রেস নেতাদের একদল বিধান রায়কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রার্থী রূপে দাঁড় করান। বিধানচন্দ্র তখন কলিকাতার বাইরে। এ ব্যাপার তিনি জানতেনও না। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতেই নির্বাচন শেষ হ'ল। তিনিই প্রেসিডেণ্টরূপে নির্বাচিত হলেন।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হবার কয়েক মাস পরেই তিনি দেখতে পান যে, কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করতে হলে যে রকম সময় ব্যয় করতে হবে তাতে তাঁর ডাক্তারী ব্যবসার ক্ষতি হয়। তাছাড়া কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলিও তখন অত্যন্ত বেশি—যার ভিতরে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

এই সব নানা কারণে তিনি পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন।

এর কিছুদিন পরেই সেন্ট্রাল এসেমব্লির নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসে। তিনি তখন শরৎচন্দ্র বসুর

সঙ্গে দেখা করে তাঁকে কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়াতে বলেন।

শরৎচন্দ্র তাতে রাজী হন না। তিনি বলেন যে, আগেই তিনি পণ্ডিত মালব্যের 'কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি'তে যোগদান করেছেন।

শরৎচন্দ্র বসুর সহায়তা না পেয়ে নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের পরাজয় হয়। শরৎচন্দ্র তখন বন্দী। কিন্তু বন্দী অবস্থাতেই দেশবাসী তাঁকেই নির্বাচিত করে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র মুক্তি পান।

তিনি মুক্তি লাভ করবার পরেই কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি তীব্র হয়ে ওঠে। বিধান রায় আপ্রাণ চেষ্টা করেন সেই দলাদলির অবসান ঘটাতে; কিন্তু কিছুই করতে পারেন না।

এর কিছুদিন পরেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসে।

বিধান রায়কে নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হওয়ায় তিনি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন।

বিধান রায় পদত্যাগ করলে শরৎচন্দ্রই নির্বাচন পরিচালনা করেন।

সে নির্বাচনের কি ফলাফল হয়েছিল, সে কথা আজও অনেকেরই মনে আছে। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে মুসলমান আর অমুসলমান এই দুই ভাগে নির্বাচন হয়। কংগ্রেস অমুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে প্রায় সবগুলি দখল করতে সক্ষম হ'লেও প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জন্য কংগ্রেস পক্ষ নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না।

বাংলা দেশে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলির মধ্যে মৌলভী ফজলুল হকের দলই লাভ করেন বেশি আসন।

এর পর মন্ত্রী-সভা গঠনের সময় এলে গভর্নর শরৎ-চন্দ্রকেই প্রথমে আহ্বান করেন, কিন্তু একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা না থাকায় তিনি তাতে রাজী হন না।

গভর্নর তখন দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে মৌলভী ফজলুল হক্ সাহেবকে আহ্বান করেন। হক্ সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হন এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিধান সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রী-সভা গঠন করেন।

হক্ সাহেবের সেই মন্ত্রী-সভায় স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকারও যোগদান করেছিলেন।

কিন্তু বাংলা দেশে মন্ত্রী-সভা গঠন করতে না পারলেও সারা ভারতের বেশির ভাগ প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা গঠিত হয়।

বিধান সভায় শরৎচন্দ্র বিরোধী পক্ষের নেতৃত্ব করতে থাকেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন।

কিন্তু গোলমাল দেখা দেয় পরের বৎসরে। স্থভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর মতের বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ান।

সেই নির্বাচনে গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়া স্থভাষচন্দ্রের কাছে পরাজিত হন।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েও স্থভাষচন্দ্রের পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব হয় না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করতে আরম্ভ করেন—যার ফলে কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি.-র সভায় স্থভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন।

সেই সময় গান্ধীজী কলিকাতায় এসে সোদপুরে বাস

করছিলেন। সোদপুর থেকে তিনি বিধান রায়কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদান করতে অনুরোধ করেন।

বিধান রায় প্রথমে গান্ধীজীর প্রস্তাবে রাজী হ'ন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ দেন।

এদিকে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করবার পরে বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি তীব্রতর হয়ে ওঠে। এমন কি বিধান রায়ের বাড়ীও আক্রান্ত হয় একদিন।

বাংলা কংগ্রেসের দলাদলি ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে মনোমালিন্য শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছে যার ফলে সমস্ত ব্যাপার ওয়ার্কিং কমিটিকে জানানো হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি শরৎচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করবার নির্দেশ দেন এবং বাংলা কংগ্রেসের ভার দেন এক অস্থায়ী কমিটির ওপরে।

এই গোলমালের সময় গান্ধীজী বিধান রায়কে বাংলার কংগ্রেস কমিটিকে পুনর্গঠন করতে অনুরোধ করেন।

গান্ধীজীর অনুরোধে বিধানচন্দ্র কংগ্রেস কমিটিকে পুনর্গঠন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না।

কংগ্রেসের মধ্যে এই গোলমাল দেখে বিধানচন্দ্র কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ—এই দু'বছর তিনি কংগ্রেসের কোন ব্যাপারেই থাকেন না। ঐ সময়টা তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্পোরেশনের ব্যাপারেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তার কিছুদিন পরেই ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ব্রিটিশ সরকারকে তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার করে বলতে বলা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা বলেন যে, ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতের প্রতি তাঁদের মনোভাব পরিষ্কার ক'রে না জানান, তাহলে সারা ভারতের কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা পদত্যাগ করবে।

ওয়ার্কিং কমিটির উপরি উক্ত প্রস্তাবে বিধান রায় মত দেন নি। তাঁর মত ছিল এই যে, মন্ত্রী-সভা বর্জন করলে সুবিধার চাইতে অসুবিধাই হবে বেশি। তিনি বলেছিলেন যে, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব (তা সে যতটুকুই হোক না কেন) যদি কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভার হাতে থাকে, তাহলে যুদ্ধের সুযোগে দেশের যুবকদের সামরিক শিক্ষায়

শিক্ষিত করা যাবে। কিন্তু মন্ত্রী-সভা বর্জন করলে এর সুযোগ হারাতে হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ডাঃ রায়ের এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন; ফলে ডাঃ রায় ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকেন না।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার মেডিক্যাল ডিপার্ট-মেণ্টে যুবকদের ভর্তির ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করেন। ডাঃ রায় গান্ধীজীর মত নিয়ে গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করতে রাজী হন।

এর পরেই আসে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক আগস্ট প্রস্তাব। ঐ প্রস্তাবের পরেই ভারত সরকার কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার করে জেলে বন্ধ করেন।

বিধান রায় ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন না বলেই বোধ হয় তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়।

এদিকে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে কর্পোরেশনের অল্‌ডার-ম্যানের একটি পদ খালি হয়। বিধানচন্দ্র ঐ পদে নির্বাচিত হন।

ভাইস-চ্যান্সেলার

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বিধান রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। তখন পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চলছে। জাপানী সৈন্য ব্রহ্মদেশে হানা দিয়ে রেঙ্গুন পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। ফলে রেঙ্গুন থেকে বহু লোক কলিকাতায় পালিয়ে এসেছে।

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা চলছে। ডাঃ রায়ের ওপরে কলিকাতার স্কুল ও কলেজগুলিতে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবার ভার দেওয়া হ'ল।

ভারতীয় বিমান-বাহিনীকেও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয় এই সময়। গভর্নমেণ্ট থেকে ডাঃ রায়কে অনুরোধ জানানো হয়, ছাত্রদের ভিতর থেকে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করে বিমান-বাহিনীতে পাঠাবার জন্যে। ডাঃ রায় গভর্নমেণ্টের এ অনুরোধ মেনে নেন এবং বহু ছাত্রকে বিমান-বাহিনীতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন।

এর কিছুদিন পরেই কলিকাতায় বোমা পড়ে। ফলে

লক্ষ লক্ষ লোক কলিকাতা থেকে পালাতে আরম্ভ করে। এই গোলযোগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ব্যাপারেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ডাঃ রায় তখন পরীক্ষা গ্রহণের এক বিকল্প ব্যবস্থা করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, যেসব পরীক্ষার্থী কলিকাতার বাইরে চলে গেছে, তাদের জন্য মফঃস্বলে কয়েকটি শহরে সাময়িকভাবে পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে।

সেই গোলমালের সময় যে রকম দক্ষতার সহিত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন, তার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডক্টর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এখানে আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ রায়ই সংক্ষিপ্ত এম. বি. কোর্সের (Condensed M. B. Course) প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার ফলে মেডিক্যাল স্কুল থেকে উত্তীর্ণ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক্তাররা ডিগ্রী লাভ করবার সুযোগ পান।

আগা খাঁ প্রাসাদে

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী অনশন সত্যাগ্রহ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গান্ধীজীকে তাঁর ঐতিহাসিক "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের পরেই গ্রেপ্তার করে আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়।

অনশন আরম্ভ করবার পর গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি নিজের কোন ডাক্তার সেখানে রাখতে চান কি না? মহাত্মাজী বিধান রায়ের নাম করেন।

গভর্নমেণ্ট তাঁকে গান্ধীজীর ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিয়ে বলে যে, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে কয়েকটি শর্তাধীনে আগা খাঁ প্রাসাদে থাকতে পারেন।

শর্তগুলি ছিল এই ঃ

১। গভর্নমেণ্টের ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ না করে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি কোন বিবৃতি দিতে পারবেন না।

২। আগা খাঁ প্রাসাদের কোন সংবাদ তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন না।

৩। তাঁহাকে প্রাসাদের ভিতরেই থাকতে হবে।

ডাঃ রায় ১নং ও ২নং শর্ত মেনে নেন কিন্তু ৩নং শর্তটি মেনে নিতে রাজী হন না। গভর্নমেণ্টকে তিনি জানিয়ে দেন যে, বন্দী-ভাবে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর চলাফেরার এবং যেখানে খুশি বাস করবার স্বাধীনতা না থাকলে তিনি ওখানে যেতে পারবেন না। গভর্নমেণ্ট তাঁর কথা মেনে নেয় এবং তাঁকে অবিলম্বে পুনা রওনা হতে অনুরোধ করে।

গভর্নমেণ্টের পরবর্তী প্রস্তাবে রাজী হয়ে বিধান রায় পুনা যান। আগা খাঁ প্রাসাদে গান্ধীজীর নিজের পক্ষে ডাক্তার ছিলেন তিনজন—বিধান রায়, ডাঃ গিলডার ও ডাঃ সুশীলা নায়ার আর গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে ছিলেন—জেনারেল ক্যাণ্ডি, কর্নেল সাও ও কর্নেল ভাণ্ডারী।

প্রথম দিকে গান্ধীজীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ১৩ দিনের দিন তিনি বমি করতে আরম্ভ করেন এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করে জানা যায় যে, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

ঐ দিনই ২-৩০ মিনিটে জেনারেল ক্যাণ্ডি, বোম্বাই-এর সার্জন-জেনারেল এবং অন্যান্য গভর্নমেণ্ট ডাক্তারেরা মনে করেন যে, গান্ধীজীর জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

এই সময় জেনারেল ক্যাণ্ডি বিধান রায়কে বলেন— ডাঃ রায়, গান্ধীজীর অবস্থা খুবই খারাপ দেখছি। এ অবস্থায় আমাকে বাধ্য হয়ে গ্লুকোজ ইন্‌জেকসন দিতে হবে।

বিধান রায় বলেন যে, গান্ধীজী তাঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে, কোন অবস্থাতেই তাঁকে গ্লুকোজ ইন্‌জেকসন দেওয়া চলবে না। অবশ্য বন্দী-হিসাবে তিনি এখন গভর্নমেণ্টের অধীন। সুতরাং জেনারেল ক্যাণ্ডি ইচ্ছা করলে জোর করে ইন্‌জেকসন দিতে পারেন। কিন্তু এতে বিপদও ঘটতে পারে। মানসিক আঘাতের ফল হয়তো খুবই খারাপ হতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহলে ডাঃ রায়কে বাধ্য হয়ে পৃথিবীর মানুষদের জানাতে হবে যে, জোর করে ইন্‌জেকসন দেবার ফলেই গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে।

বিধান রায়ের এই কথায় গভর্নমেণ্ট ডাক্তাররা জোর করে ইন্‌জেকসন দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। জেনারেল ক্যাণ্ডি তখন গান্ধীজীর কাছে গিয়ে তাঁকে

ইন্‌জেকসন নিতে রাজী হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু যখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর চোখে জল।

তিনি গান্ধীজীকে রাজী করাতে পারলেন না। তাঁর হয়তো মনে হ'ল যে, এইবারই বুঝি সব শেষ!

এরপর ডাক্তাররা মিলে এক বিজ্ঞপ্তি বের করলেন—তাতে লেখা হল—গান্ধীজীর অবস্থা খুবই গুরুতর। যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অলৌকিক কিছু না ঘটে, তাহলে তাঁর অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে।

এই সময় বিধান রায় গান্ধীজীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন ৪ আউন্স লেবুর রস খেতে। তিনি বলেন যে, এতে পাকস্থলী ঠাণ্ডা হবে, অথচ উপবাসের কোন হানি হবে না। গান্ধীজী বিধানচন্দ্রের কথা মেনে নেন। চার আউন্স লেবুর রস তিনি পান করেন। এর ফলে অলৌকিক ব্যাপার দেখা দেয়। বমি বন্ধ হয়। তিনি সহজভাবে জল খেতে পারেন এবং প্রস্রাব করেন। ১২ ঘণ্টা বাদে তাঁর প্রস্রাব হয়।

রাত ন'টার সময় বিধান রায় আগা খাঁ প্রাসাদ থেকে বাইরে যান। তখন আর গান্ধীজীর সম্বন্ধে তাঁর কোন ভয় নেই।

পরদিন সকাল ৮টায় বিধান রায় যখন আগা খাঁ প্রাসাদে গেলেন, তিনি দেখতে পেলেন—দরজার সামনে বহু রিপোর্টার দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে ইংরেজ ও আমেরিকান রিপোর্টার অনেক ছিলেন।

একজন আমেরিকান রিপোর্টারের বুকের অনেক জায়গায় রক্তের দাগ দেখে ডাঃ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বুকে রক্ত কিসের ?

রিপোর্টার উত্তর দেন—মশার কামড়ের। আমি সারা রাত গেটের বাইরে বসেছিলাম। তাই সুযোগ পেয়ে মশা বেচারারা কিছু রক্ত শোষণ করেছে।

এই সময় আর এক ব্যাপার দেখা যায়। হঠাৎ বিরাট একদল সৈনিক মার্চ করতে করতে সেখানে এসে হাজির হয়।

হঠাৎ সৈনিকদের আগমনে হতচকিত হয়ে রিপোর্টাররা জিজ্ঞাসা করেন—একি ব্যাপার ? হঠাৎ এত গার্ডের কড়াকড়ি কেন ?

ডাঃ রায়ও অবাক হয়েছিলেন এই ব্যাপার দেখে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ওরা এসেছে মহাত্মার শবদেহ শোভাযাত্রা করে নিয়ে যেতে ! গতরাত্রে সেই বিজ্ঞপ্তি বের হবার পর জেনারেল ক্যাণ্ডি ব্যক্তিগতভাবে

রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, রাত্রি কাটবে না। তাই এই ব্যবস্থা।

এই ব্যাপারের পর থেকে পুনরায় গভর্নমেণ্ট অফিসারদের উপরে হুকুম আসে যে, যা করতে হয়, মহাত্মার মৃত্যুর পরে যেন করা হয়। এভাবে কাজ করলে জনসাধারণের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

বিধান রায় যখন গান্ধীজীর ঘরে যান, তখন দেখতে পান যে, তাঁর অবস্থা অনেক ভাল।

সে যাত্রা গান্ধীজী রক্ষা পেয়ে যান।

এর পরও গান্ধীজীকে আটক রাখা হয়। ১৯৪৫ সালে ভারত-সচিব বিধান রায়কে অনুরোধ করেন, গান্ধীজীকে আর একবার দেখতে। গান্ধীজী তখন 'অ্যাঙ্কাইলো-স্টমিয়াসিস্' (**Ankylostomiasis**) রোগে ভুগছিলেন। বিধান রায় তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রিপোর্ট পাঠান। এর পরেই গান্ধীজীর মুক্তির হুকুম আসে।

সাংবাদিক

সাংবাদিক হিসাবেও বিধান রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ফরোয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 'ফরোয়ার্ড'-এর প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্বই তাঁর ওপর এসে পড়ে।

সেই সময় তিনি যদি পত্রিকাখানার দায়িত্ব না নিতেন, তাহলে হয়তো দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'ফরোয়ার্ড'-এরও মৃত্যু হতো।

ডাঃ রায় শুধু যে পত্রিকার আর্থিক দায়িত্বই নিয়েছিলেন তাই নয়, সম্পাদকীয় নীতি নির্ধারণ, মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা, পণ্ডিত লোকদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাদি সংগ্রহ প্রভৃতি বহু কাজই বিধান রায় করতেন।

কিন্তু শত চেষ্টাতেও পত্রিকাখানাকে রাখতে পারলেন না তিনি। দেনার দায়ে পত্রিকা অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর 'লিবার্টি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'লিবার্টি'রও তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ।

'লিবার্টি' পত্রিকা কিছুদিন চালাবার পর কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে, 'ফরোয়ার্ড'-এর 'গুড্-উইল' কিনে নিয়ে 'লিবার্টি'কে 'ফরোয়ার্ড' নামে পরিবর্তিত করতে হবে। বলাবাহুল্য, এ ব্যাপারে ডাঃ রায়ের উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ফরোয়ার্ড' প্রকাশিত হলে ডাঃ রায় তার সমস্ত দায়িত্ব নিজে বহন করতে থাকেন। সম্পাদক না হয়েও তিনি সম্পাদকীয় ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে থাকেন।

পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করতেন। ভাল ভাল সংবাদ সংগ্রহ এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে প্রকাশ করবার ব্যাপারে তিনি বার্তা-বিভাগকে সব সময় নির্দেশ ও পরামর্শ দিতেন।

বর্তমান ইউনাইটেড প্রেস স্থাপনের ব্যাপারেও বিধান-চন্দ্রের দান অনেক।

বিধুবাবু (বিধুভূষণ সেনগুপ্ত) যখন 'ফ্রী-প্রেস'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এসে ডাঃ রায়কে নূতন একটা সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে সাহায্য করতে বলেন, তিনি তখন আনন্দের সঙ্গেই তাতে স্বীকৃত হন।

ফ্রী-প্রেসের কর্ণধার এস সদানন্দের সঙ্গে বিধুবাবুর মতানৈক্য হবার কারণ এই যে, এস সদানন্দ চেয়েছিলেন ফ্রী-প্রেসের কর্তৃত্বাধীনে কতকগুলি পত্রিকা প্রকাশ করতে, কিন্তু বিধুবাবু বলেন যে, এতে সংবাদ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সুনাম ব্যাহত হবে।

এস সদানন্দ বিধুবাবুর প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হন না ; ফলে বিধুবাবু ফ্রী-প্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

যাই হোক, বিধান রায় যখন বিধুবাবুর উদ্দেশ্যের কথা শুনলেন, তখনই তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন যে, এ কাজে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

নূতন প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয় 'ইউনাইটেড প্রেস'।

বিধুবাবু হন ঐ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও ম্যানেজিং এডিটার এবং ডাঃ রায় হন ডিরেক্টার বোর্ডের সভাপতি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু হবার পর বাংলার মুখ্য মন্ত্রী হন ফজলুল হক সাহেব। তারপর দলনীতির ঘুটি চালাচালিতে পাশা উলটে যায়। মুখ্য মন্ত্রীর গদী দখল করেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনিও বেশী দিন স্থায়ী হন না। সহিদ সুরাবর্দী সাহেব দখল করেন মুখ্য মন্ত্রীর গদী। বাংলাদেশে তখন মুসলীম লীগের জবরদস্ত শাসন।

ওদিকে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করলেন। মুসলীম লীগ দাবি করল পাকিস্তান।

এই পাকিস্তানের দাবিকে কায়েম করতে লীগ প্রেসিডেণ্ট মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নার (পরবর্তী কালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের গভর্নর-জেনারেল) নির্দেশে 'ডাইরেক্ট অ্যাকসনে'র নামে এক বীভৎস হত্যালীলার অনুষ্ঠান হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট কলিকাতার মুসলমানরা হঠাৎ হিন্দুদের ওপর আক্রমণ আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বেধে যায় হিন্দু-মুসলমানে মারামারি। উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক প্রাণ দেয় সেই দাঙ্গায়—সম্পত্তি নষ্ট হয় বহু কোটি টাকার।

এই সব নানা গোলমালে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ দেশ বিভাগ মেনে নেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

এদিকে বাংলাদেশ তখন ভাগ করার কাজ আরম্ভ হয়েছে। কংগ্রেস-নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রস্তাবিত হিন্দুপ্রধান অংশের জন্য মুখ্য মন্ত্রী মনোনীত হয়ে সহিদ সুরাবর্দীর মন্ত্রী-সভার পাশে ছায়া মন্ত্রী-সভা চালাতে থাকেন।

তারপর বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ নামে দু'টি আলাদা প্রদেশের সৃষ্টি হয়। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী থেকে যান।

এই সময় বিধান রায় ভারতে ছিলেন না। চিকিৎসার জন্যে তিনি তখন আমেরিকায় ছিলেন। জাতীয় সরকার

বিধানচন্দ্রকে যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) গভর্নর পদে মনোনীত করেন।

পণ্ডিত নেহেরু টেলিফোনে তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ভারতে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন।

ডাঃ রায় কিন্তু গভর্নরের পদ গ্রহণ করতে রাজী হন না। পণ্ডিতজীকে তিনি ঐ পদের জন্য অন্য কোন নেতাকে নির্বাচিত করতে অনুরোধ করেন।

ডাঃ রায়ের অস্বীকৃতির ফলে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। ডাঃ রায় এতে খুবই খুশী হন।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই তিনি গভর্নরের পদ ত্যাগ করেন। এই সময় একদিন তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে মহাত্মাজী কৌতুক করে বলেন—বিধান, তুমি গভর্নরের পদ ত্যাগ করেছ বলে তোমাকে আর 'ইয়োর একসেলেন্সী' বলতে পারছি না।

ডাঃ রায় মৃদু হেসে উত্তর দেন—তার জন্য দুঃখ করবেন না, বাপুজী। আমাকে আরও বড় কিছু বলবার সুযোগ দিচ্ছি। আপনি আমাকে 'রয়েল হাইনেস' বলতে পারেন, কারণ 'Roy' থেকে 'Royal' আর অনেকের থেকে আমি বেশী লম্বা সেই হিসাবে 'Highness' বলা খুবই সংগত।

এই উচ্চাঙ্গের রসিকতায় গান্ধীজী হো হো করে হেসে ওঠেন।

আগেই উল্লেখ করেছি, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী। কিন্তু অতি ভাল মানুষ বলে

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের বিভিন্ন দলগুলিকে বশে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

সেই সময় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দিল্লীতে ছিলেন। তিনি বিধানচন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ রায়কে বিধানসভায় প্রবেশ করতেও অনুরোধ করেন তিনি।

প্রকৃতপক্ষে ডাঃ মুখার্জীর অনুরোধেই ডাঃ রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট-কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় প্রবেশ করেন।

ডাঃ রায় বিধান সভায় প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁকে মন্ত্রী-সভায় আসতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু বিধানচন্দ্র তখন তাতে রাজী হন না।

এর কিছুদিন পরে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিধান রায়ের পক্ষে তখন আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হয় না। পরিণত বয়সে ডাক্তারিতে ভারতজোড়া নাম ও মাসিক বহু সহস্র টাকা আয়ের কথা একবারও চিন্তা না করে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী হন এবং মৃত্যুকাল অবধি তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুখ্য মন্ত্রী

ভারত-রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের যে কয়জন মুখ্য মন্ত্রী সর্ব-ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁদের একজন। শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা, নির্ভীকতা ও সততা সর্বজন-স্বীকৃত।

বিধানচন্দ্র মুখ্য মন্ত্রিত্ব যখন গ্রহণ করেন, তখন পশ্চিম বাংলার অবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক। স্বাধীনতার মূল্য-হিসাবে বাংলার মর্মভেদ ক'রে যে ছুরিকা চালানো হয়, তার ক্ষত তখনও শুকোয়নি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক—সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় বিশৃঙ্খলা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কাতারে কাতারে আসতে থাকে সহায়হীন সম্বলহীন উদ্বাস্তুর দল। এ ছাড়া বাংলার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে চিরাচরিত উপদলীয় বিবাদ তো আছেই। এ সকল বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের ঊর্ধ্বে উঠে পশ্চিম বাংলার শাসন-দণ্ড দৃঢ় হস্তে ধরলেন ডাঃ রায়।

মানবোচিত দরদী হৃদয় নিয়ে তিনি প্রত্যেক সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হলেন। প্রতিভা-দীপ্ত মন ও নিরলস কর্ম-প্রেরণা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল পশ্চিম বাংলার শ্রীবৃদ্ধির পথে।

ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার নানাক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। এখানে মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করা গেল।

কলিকাতা শহরে জন-সমাগমের অত্যধিক চাপ হ্রাস করার জন্যে ডাঃ রায়ের মন্ত্রী-সভা পশ্চিম বাংলার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র নগর গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়ার নিকট নির্মিত কল্যাণী নগরের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

কলিকাতার পল্লীর মধ্যে খাটাল রাখা স্বাস্থ্যের বিঘ্নকর। অপরপক্ষে গোয়ালারা যে দুধ বিক্রি করে তা' যেমন চাহিদার দিক দিয়া অল্প, তেমনি দূষিত। ডাঃ রায় দেখলেন, কলিকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নিতে হ'লে অথচ কলিকাতাবাসীদের প্রচুর খাঁটি দুধ যোগান দিতে হ'লে এই শহরের আশে-পাশে গড়ে তুলতে হবে 'দুগ্ধ-পল্লী'। হরিণঘাটা দুগ্ধ-পল্লী এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই তৈরি করা হয়েছে।

কলিকাতার পথে যান-সমস্যা একটি দুরূহ ব্যাপার ছিল। সরকারী বাস প্রচলন করে বিধানচন্দ্র একদিকে যেমন যান-সমস্যার সুরাহা করলেন, অপর দিকে শত শত বেকার বাঙ্গালী যুবক ঐ কাজে চাকরি পেল।

জমিদারী-প্রথা বাঙ্গালী জাতিকে করেছে কর্মবিমুখ। এই প্রথাকে উচ্ছেদ করে ডাঃ রায় বাংলার জাতীয় জীবনে আনলেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাঁর কর্তৃত্বাধীনে চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। বাংলার ছেলেদের মন যাতে কারিগরী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে, এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি কারিগরী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে। কৃষি-উন্নতির জন্যে কোথাও কোথাও

বিজ্ঞান-সম্মতভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরূপ বহু জনহিতকর কার্যের জন্যে ডাঃ রায়ের মন্ত্রী-সভা গর্ববোধ করতে পারেন। এ ছাড়া ডাঃ রায়ের মস্তিষ্ক-উদ্ভাবিত বহু পরিকল্পনা এখনও কার্যে পরিণত হওয়ার পথে।

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার একত্রীকরণ প্রস্তাব নিয়ে বিধানচন্দ্রকে নানা কঠোর সমালোচনা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এই প্রস্তাবের একটা কল্যাণকর দিকও ছিল, সমালোচনার কূট তর্কজালে সে কথা ভুললে আমাদের চলবে না। যা' হোক, বিধানচন্দ্র নিজেই এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সারা ভারত-ব্যাপী যে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে নির্বাচনেও কংগ্রেস দলের প্রার্থী-রূপে ডাঃ রায় জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনে তাঁর বিরোধী পক্ষ খুব তোড়জোড় করেছিল। কিন্তু নিছক ব্যক্তিত্বের জোরেই ডাঃ রায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যমণ্ডিত হন। কংগ্রেস দল সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকেই এই বারের জন্যেও মুখ্য মন্ত্রীর পদে মনোনীত করে।

এর পর তাঁর জীবনের শেষ নির্বাচন প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯৬২ সালে। এবারও তিনি অপরাজিত হয়ে মুখ্য মন্ত্রীর আসনে ফিরে আসেন।

পশ্চিম বাংলার মত সমস্যামূলক একটি রাজ্যের মুখ্য

মন্ত্রী হ'য়ে কেমন ক'রে বিধানচন্দ্র প্রশংসার সহিত শাসন-কার্য পরিচালনা ক'রে চলেছেন, এ প্রশ্ন অনেকের মনে উঠতে পারে। কোন রাজনৈতিক দলবিশেষের নেতা বলতে ঠিক যা বোঝায় বিধানচন্দ্র তা' নন। তবে তিনি এ শক্তি পেলেন কোথা থেকে ?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে আমাদের ফিরে যেতে হবে ডাঃ রায়ের রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে একদিন বলেছিলেন—ক্ষমতা নিয়ে যারা কাড়াকাড়ি করে, ক্ষমতা তারা পায় না ; কিন্তু ক্ষমতার প্রতি যারা উদাসীন, ক্ষমতা ফেরে তাদের পিছনে পিছনে। দেশবন্ধুর এই কথা ডাঃ রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তাঁর জীবনে। সেইজন্যে ক্ষমতা তাঁর কাছে নিজে ধরা দিয়েছে—চেষ্টা করতে হয়নি তাঁকে ক্ষমতা লাভের জন্যে।

ক্ষমতার জন্যে লোভ করেননি ব'লে ডাঃ রায় যে কাজ নিজে ন্যায় ব'লে ভেবেছেন, দৃঢ়তার সঙ্গে সে-কাজ ক'রে গেছেন। কোন দল বা ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থ তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। এই দুর্বার গতিই বিধানচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে ক'রে তুলেছে মহান্। এই কারণেই, বিরোধী দলের অনেক নেতাকেও ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করতে দেখি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীকে। তাঁর জীবনের বহু দিক নিয়ে আলোচনা করলেও আরও কয়েকটি বিষয় না বললে তাঁর জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

'বাঙালী কর্মবিমুখ অলস'—এই কথা বহুবার বহু

লোকে উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁরা ভুলে যান তখন ডাঃ রায়ের কথা। অশীতিপর বৃদ্ধ ডাঃ রায়কে দেখেছি সকাল ৭টা থেকে নিজের ঘরে বসে, বিনা ভিজিটে রুগী দেখতে। মনে হত বুঝি তাঁর ক্লান্তি নেই।

সহকারী দুজন কম বয়সের ডাক্তার কেবল তাঁর ব্যবস্থাপত্র লিখতে লিখতে হাঁপিয়ে উঠতেন। রুগীর ভিড়ই বা কত? শুধু একবার দেখা নয়, তেমন তেমন রুগী হলে তিনি নিজে বলে দিতেন, ওষুধ ব্যবহার করে কয়েকদিন পরে এসে রুগীরা যেন তাঁকে খবর দিয়ে যায়।

সাড়ে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী এসে লাগত তাঁর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ীর গেটের সামনে। ডাঃ রায় তারই মধ্যে রুগী দেখা শেষ করে চলে যেতেন সরকারী ভবন রাইটার্স বিল্ডিংএ। সেখানে ডুবে যেতেন তিনি কাগজপত্র আর ফাইলের মাঝখানে।

তারপর বেলা একটার সময় সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে তিনি আবার ডুবে যেতেন সেই কাজের মধ্যে।

তার মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের দেখাশুনা তো আছেই।

বিকেলে সভাসমিতি বা রাইটার্স বিল্ডিংএ প্রথম প্রহর কাটিয়ে তিনি ফিরে আসতেন নিজের বাড়ীতে।

ছুটির দিন দর্শক, পরিচিতদের আনাগোনার শেষ ছিল না। সকলকেই তিনি অভ্যর্থনা জানাতেন হাসিমুখে। বিস্মিত হয়ে ভেবেছি ডাঃ রায় পারেন কি করে!

তাঁর রুগীদের ব্যবস্থাপত্রেও দেখেছি অতি আধুনিক ওষুধের নাম যা অনেক সময় ভারতবর্ষে এসে পৌঁছোয়নি। এত পড়াশুনাই বা তিনি করতেন কখন ?

এছাড়া বাংলা দেশের প্রতিটি বেকার যুবকের জন্য তিনি চিন্তিত।

দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঙালী জাতকে মনপ্রাণ দিয়ে তিনি ভালবেসেছেন, যেমনি ভালবেসেছিলেন তাঁর পূর্বতম পুরুষ প্রতাপাদিত্য রায়। সার্থক হোক তাঁর স্বপ্ন।

ভগবানের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা ছিল ডাঃ রায়কে তিনি যেন দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মাঝখানে বাঁচিয়ে রাখেন।

বাংলার দুর্দিনে স্রোতের মুখে তিনি যেন কাণ্ডারীর মত হাল ধরে নিয়ে যেতে পারেন উন্নতির পথে।

কিন্তু আমাদের এই প্রার্থনা ভগবানের দরবারে যেন পৌঁছুলো না। নিষ্ঠুর বিধাতা শেল হানলেন বাঙালীর বুকে। তা ঘটলো আবার তাঁরই জন্মদিনে। ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই প্রতি বছরের মতন গিয়েছিলাম নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটে ডাঃ রায়ের বাড়ীতে দেখা করতে।

প্রতিবার দেখেছি তাঁকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন পরিবৃত হয়ে হাসিমুখে জন্মদিন পালন করতে।

কখনও বা নীচের হল ঘরটায়, কখনও বা নিজস্ব বসবার ঘরে।

এবারে কিন্তু দেখলাম তেমন ব্যবস্থা নেই।

বিস্মিত হয়ে গিয়ে ভাবলাম, এমনটি তো কখনও দেখিনি।

সেক্রেটারিকে প্রশ্ন করে জানলাম, ডাঃ রায় অসুস্থ। চিকিৎসকের নির্দেশ আছে ক'দিন বিশ্রাম নিতে। কথা বলা বারণ।

জন্মদিনের উপহার টেবিলটার ওপরে জমা হচ্ছে। আমারই মত তাঁর গুণগ্রাহী ভক্ত সকলে সেখানে জমা হচ্ছেন। সকলেরই মুখে সেই এককথা—ডাঃ রায় কোথায় ? ডাঃ রায় কোথায় ?

সকলকে সেই একই উত্তর দিয়ে তাঁর সেক্রেটারি তাঁর কর্তব্য পালন করছেন।

বাড়ী থেকে বেরুতে বেরুতে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, আজকের দিনে যাঁকে কেন্দ্র করে উৎসব তিনিই উপস্থিত নেই !

প্রিন্সেপ স্ট্রীট দিয়ে তখন বহু লোক আসছেন ডাঃ রায়ের জন্মদিনে শুভকামনা জানাতে।

হঠাৎ মনে হল, আগের দিনে খবরের কাগজে দেখেছি, ডাঃ রায় সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই ভারতের রাষ্ট্রপতি কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন।

কিন্তু তখন ভাবতেও পারিনি তিনি এতখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

সেক্রেটারি বলেছিলেন চার-পাঁচ দিন বাদে, আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

সেই আশা নিয়ে সেদিন তাঁর বাড়ী থেকে ফিরে এলাম।

দুপুর বেলায় সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম মুখ্য মন্ত্রী বিধানচন্দ্র বারোটার সময় পরলোক গমন করেছেন।

কথাটা শুনে বিশ্বাস হল না।

তাই আবার শুনলাম। নাঃ তিনি নেই। ছুটে গেলাম আবার সেই মুখ্য মন্ত্রীর বাড়ীতে। তখনও কলকাতার সমস্ত জনতা খবরটা পাননি। দু'একজন করে জমায়েত হচ্ছেন তাঁর বাড়ীর সামনে।

গেলাম তাঁর ওপরের ঘরে। যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন ডাঃ রায়।

মুখে কোনও রকম বিকৃতি নেই।

ক্রমশঃই ভিড় বাড়তে থাকে তাঁর বাড়ীতে।

বেলা আড়াইটের সময় থেকে আর কাউকে তাঁর বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

জনসাধারণের মধ্যে থেকে দাবি উঠতে থাকে একবারটি দেখতে দাও।

বিকেলবেলায় তাঁর নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিধানপরিষদ ভবনে। সেখানে শবদেহ রক্ষিত হয় জনসাধারণের দেখার জন্যে।

ক্রমশঃ পুলিস পাহারায় কলকাতার নরনারীরা এসে তাঁদের প্রিয় নেতাকে শেষ বারের মতন শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে থাকেন।

রাত যত গভীর হতে থাকে ভিড়ের চাপও তত বাড়তে থাকে।

ট্রাম নেই, বাস নেই, পায়ে হেঁটে, অগণিত জনতা আসেন কর্মবীর বিধানচন্দ্রকে শেষ বারের মত দেখবার জন্যে।

গাঢ় শোকের ছায়া নেমে আসে কলকাতার বুকে।

সকাল সাড়ে ছটার সময়, তাঁর নশ্বর দেহকে নিয়ে শোভাযাত্রা সহ যাওয়া হয় রাইটার্স বিল্ডিং-এ।

তারপর মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কেওড়াতলা শ্মশানে।

রাস্তার ফুটপাথ, জানালা, বারান্দা সব ভরে যায় জনতার চাপে।

সকলেই শেষ বারের মত দেখতে চান তাঁদের প্রিয় নেতাকে।

ভবানীপুর, বালীগঞ্জ অঞ্চলে বহু জায়গায় দেখেছি, ফুটপাথ, বারান্দা বা জানালায় জায়গা সংগ্রহ করতে না পেরে লোকে জায়গা করে নিয়েছে ট্রামের মাথায়, নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে।

বেলা একটা চল্লিশে ডাঃ রায়ের মরদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে শুইয়ে দিয়ে তাতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করা হয়।

হুহু করে বৈদ্যুতিক চুল্লী জ্বলে উঠলো। মনে হল তাঁর শেষচিহ্নটুকুও লোপ হয়ে গেল।

বাঙালীর দরদী বন্ধু আর কেউ রইলো না, যিনি

অভয় দিয়ে বলবেন—তোমরা এগিয়ে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হল, ইতিহাসে পড়েছি, বুদ্ধদেব বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই তিথিতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং তাঁর নির্বাণও হয়েছিল ঐ বৈশাখী পূর্ণিমায়।

ডাঃ রায়ের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এক। তাঁরা দুজনেই চেয়ে গেছেন মানুষের কল্যাণ।

সমাপ্ত

জীবন-পঞ্জী

১লা জুলাই, ১৮৮২	… জন্ম (বাঁকিপুর, পাটনা)
জুন, ১৯০১	… মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯	… বিলাত যাত্রা
জুলাই, ১৯১১	… ভারতে প্রত্যাবর্তন
১৯১৬	… কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য নির্বাচিত
১৯২৩	… আইন-সভায় সদস্য নির্বাচিত
২৬শে আগস্ট, ১৯৩০	… ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার
১৯৩১	… কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত
অক্টোবর, ১৯৩৪	… বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত
১৯৪১	… কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত
২রা জুন, ১৯৪৭	… ইউরোপ যাত্রা
১লা নবেম্বর, ১৯৪৭	… ভারতে প্রত্যাবর্তন
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৮	… পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রীর পদগ্রহণ
২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৭	… তৃতীয় বার মুখ্য মন্ত্রীর পদ-গ্রহণ
৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৭	… প্রথম বৎসরের জন্যে পূর্ব আঞ্চলিক পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনীত
২রা মে, ১৯৫৭	… যাদবপুরে জাতীয় যন্ত্র কারখানার উদ্বোধন
১লা জুলাই, ১৯৬২	… মৃত্যু

———

বিশ্ব-প্রতিভা-সিরিজ

১ ।	দানবীর কার্নে গী—(পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)	১·০০
২ ।	ঋষি অরবিন্দ—(চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী)	১·২৫
৩ ।	দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)	১·২৫
৪ ।	বলদর্পী হিটলার—(যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)	১·২৫
৫ ।	প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট—(সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী)	১·০০
৬ ।	যাদুকর মার্কনি—(নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)	১·০০
৭ ।	সমুদ্রজয়ী কলম্বাস— (ঐ)	১·০০
৮ ।	এব্রাহাম লিঙ্কন— (ঐ)	১·০০
৯ ।	মহাপুরুষ আশুতোষ—(যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)	১·০০
১০ ।	ভগবানের চাবুক—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)	১·০০
১১ ।	আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)	১·০০
১২ ।	নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(হেমেন্দ্রবিজয় সেন)	২·০০
১৩ ।	সত্যাশ্রয়ী বাপুজী—(যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)	২·০০
১৪ ।	রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল—(নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)	১·২৫
১৫ ।	গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ—(যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	১·৫০
১৬ ।	বিপ্লবী ষ্টালিন—(দীনেশ মুখোপাধ্যায়)	১·০০
১৭ ।	বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা—(শান্তি দেবী)	১·০০
১৮ ।	জনসেবক লেনিন—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)	১·৫
১৯ ।	লৌহমানব সর্দ্দার প্যাটেল—(পাঁচুগোপাল মুখোঃ)	১·৫
২০ ।	মহামনীষী জর্জ্জ বার্ণার্ড্ শ—(যোগেশ বন্দ্যোঃ)	১·০
২১ ।	কায়েদী আজম জিন্নাহ্—(ওয়াজেদ আলী)	১·৫
২২ ।	ছোটদের হজরত মহম্মদ—(এস্, ওয়াজেদ আলী)	১·০
২৩ ।	জনসেবক বিধানচন্দ্র রায়—(মধুসূদন মজুমদার)	১·৫